মেথড্ জানিস্? রাতে ফর্টি টু এক্‌জেম্পলের প্রথম দশটা আঁক করে' রাখিস্ তো! বুঝ্‌লি?

রাত করে' আমার ঘরে এসে হাজির। বল্লে—বাবাঃ এত টাস্ক্ করা যায় না। ভাল্‌গার ফ্র্যাক্‌শান্-এর সাম্‌গুলো কাল ভোরেই চাই। বই খাতা ছুঁড়ে দিলে।

বল্লাম—এখানে বোস। টপাটপ্ কষে' ফেল্লুম বলে'।

—এখানে বস্‌ব কি রে? আস্‌মানী ভুরু কুঁচ্‌কোল'।

—তবে চল, তোমার ঘরে যাই...

—হ্যাঁ, লোকে জানুক চাকরের কাছ থেকে আঁক শিখ্‌ছে! কাল ভোরেই চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।

আশ্চর্য্য! আস্‌মানী একবারো জিজ্ঞাসা করে না, কোথা থেকে আঁক শিখ্‌লাম! তা জান্‌বার ওর এতটুকু প্রয়োজন নেই।

বুঝ্‌তাম, টিমু-দা ওর ইংরিজির মাষ্টার। বল্‌তাম—অঙ্কের তা হলে একটা আলাদা মাষ্টার রাখ্‌লেই হয়!

বল্‌ত—আমার তো য্যাডিশ্যানাল্ নেই।

আস্‌মানী অঙ্কের জন্য মাষ্টার রাখে না, চাকর রাখে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আস্‌মানী একটা হুলুস্থূল বাধিয়েছে। দেবদারুর আর খেজুর পাতায় ঘরের দেয়াল সাজাচ্ছে—পছন্ জল ঢেলে ঝাঁট্ দিচ্ছে মেঝেয়্—মেয়ের দল কোমরে আঁচল টেনে ছুটোছুটি কর্‌ছে। আস্‌মানী বল্‌লে—মক্‌বুল, কিছু দিশি ফুল কোথাও থেকে জোগাড় করে আন্‌তে পারিস্ লক্ষ্মীটি? টিমু-দা গেছে মার্কেটে—সেখানে তো বাহার বিলিতি ফুলের! পার্‌বি ভাই?

লক্ষ্মী! ভাই! আস্‌মানীর কী আজ? টাট্‌কা জুঁইর মতো দেখ্‌তে! পা দুখানি যেন পদ্মের পাঁপ্‌ড়ির মতো!

—পার্‌ব।

টালিগঞ্জের পথে আবার। ফুল তো দূরের কথা, একটা সিগ্‌রেট্ কিন্‌বার পর্য্যন্ত পয়সা নেই। তবু জোগাড় করে' দিতেই হবে। আস্‌মানীর হুকুম!

কোথায় ফুল ফুটেছে কে জানে? সেদিন রোদে বহুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো টহলদারি করেছিলাম মনে আছে। কোথাও ফুল পাই নি। সে ফুল কোথাও পাওয়া যায় না।

বাড়ী যখন এলাম, আস্‌মানী একবার শুধোলও না কত ফুল আন্‌লাম। ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে ঘর আর মেয়েদের শাড়ী ভুর্‌ভুর্ কর্‌ছে। টিমু-দা'র গরদের পাঞ্জাবী-টাও। কত রকমের গান, কত রকমের বাজ্‌না, কত রকমের হাসি। কোনো মেয়ে টিমু-দা'র পাঞ্জাবীর বোতামের গর্ত্তে ফুল গোঁজে, ফেরা-ফির্‌তি ধুপের কাঠি জ্বালিয়ে টিমু-দা মেয়েদের চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়। বেজায় ফুর্ত্তি!

আস্‌মানী আমাকে ডেকে নিয়ে বল্‌লে—এই ছোঁড়া, আমার মখ্‌মলের চটিটা দেখেছিস্—যেটা টিমু-দা প্রেজেণ্ট্ দিয়েছিল—

—আমি কি জানি?

—তা হলে কে আর জান্‌বে? তুই-ই ত সাফ্ কর্‌তিস্। বল্ শীগ্‌গির কোথায় আছে? খোঁজ্।

পাতি পাতি করে খুঁজ্‌লেও পাওয়া যায় না।

আসমানী একেবারে কান্না জুড়ে দিলে আর কি।—মখমলের চটিটা না হ'লে ড্রেসের সঙ্গে স্যুটই কর্‌বে না। একমাসও হয় নি টিমু-দা কিনে দিয়েছে। ও টিমু-দা, জুতো পাচ্ছি না।

টিমু-দা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কাকে মার্‌তে?

এই মকবুল ছোঁড়াটাকে।

সমস্ত বাড়ী সজাগ হয়ে উঠ্‌ল জুতো খুঁজতে। দাদাবাবু বল্‌লে—ইস্কুলে কোথায় ফেলে এসেছিস, কিম্বা টিমু-দাকেই হয় ত উল্টো প্রেজেণ্ট দিয়েছিস কে জানে? কি হে টিমু?

হঠাৎ আস্‌মানী ঘোষণা কর্‌লে—যে পাবে তাকে দুটো টাকা দোব। ওরে মকবুল, ওরে পছন্, খোঁজ দু' টাকা।

টিমু-দা পকেট থেকে দুটো টাকা তুলে বাজিয়ে বল্‌লে—এই ত্মাখ্।

টাকার ভারি টানাটানি। দুটো টাকা, মন্দ কি! কতদিন একটু ধোঁয়া পর্য্যন্ত গিল্‌তে পারি নি।

পছন্‌টা একেবারে কোমর কেছে খুঁজ্‌তে লেগেছে—আস্তাকুঁড় পর্য্যন্ত। হাসি পায়।

ঘরে এসে প্যাটরাটা খুলে ফেল্‌লাম। বইগুলির তলায় জুতো জোড়া।

ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লাম—তোমার জুতো পেয়েছি দিদিমণি। দাও টাকা।

—কৈ? কোথায় পেলি?

আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লাম—ঐ ওথানে আল্‌নার তলায়...

একটি মেয়ে বল্‌লে—কক্‌ক্ষনো না। আমি আর শুচি-দি ওথানটায় পাঁচবার খুঁজে এসেছি।

টিমু-দা বল্‌লে—আমিও। তুই মিথ্যে কথা বল্‌ছিস্। তুই চুরি করেছিলি।

টিমু-দা'র আক্রোশ ছিল। তক্ষুনিই কানটা ধরে' ফেল্‌লে।

—কান ধর্‌বেন না বল্‌ছি, খবরদার।

—কী? এই জুতো দিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ব। ব'লেই টিমু-দা আসমামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লে।

—ছিঃ, এ কি হচ্ছে টিমু? বলে' দাদাবাবু টিমু-দা'র হাত থেকে জুতোটা ছিনিয়ে নিলে।

টিমু-দা বল্‌লে—ওকে তাড়াও। ও ব্যাটা চোট্টা, জুতো চুরি করে'—

দাদাবাবু বল্‌লে—সে বিষয়ে তোমার কোশ্চেন্ করারই রাইট নেই। জুতো পাওয়া গেলে দুটো টাকা দেবে এই তোমার কন্‌ট্র্যাক্ট। আর যে এই জুতো চুরি কর্‌বে সে কি জানে না এটার দাম দু টাকার ঢের বেশি?

টিমু-দা'র সত্যবাদিতা এতে একটুও পীড়িত হয় না। দাদাবাবু আস্‌মানীর হয়ে টাকা দিতে চায়।

বলি—কি হবে টাকা নিয়ে?

আস্‌মানীর জন্মদিনের সন্ধ্যাটা আমার অপমানের অশ্রুতে করুণ হয়ে উঠেছিল—সে কি কেউ জানে? সেইদিনই আমার চোখের জলের সত্যিকারের জন্মদিন।

ক'দিন থেকে দাদাবাবুর যেন কি হয়েছে।—ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্—কেউ একটু খোঁজও করে না।

দাদাবাবু বল্লে কল্‌কাতা থেকে পালাই চল্, মক্‌বুল।

মা বাবা কেউ বারণ করে না, বলেন—যা ভাল বোঝ কর! যে যা ভাল বোঝে, সে তাই করে। আস্‌মানী যদি বলে, চুল বাঁধ্‌ব না, চুল বাঁধেই না; যদি বলে, ইস্কুল কামাই কর্‌বই, কে ওকে কামাই না করায়?

দু'দিনের মধ্যেই সব গোছগাছ হয়ে গেল।—সঙ্গে পাঁড়েজি আর আমি। ট্যাক্সিটা কদ্দূর এগোতেই দাদাবাবু নেমে বল্লে—আদৎ জিনিসটাই ফেলে এসেছি।—বন্দুকটা।

পেছনের ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীতে মাল আর পাঁড়েজি।

মা বলে' দিয়েছিলেন—যে যে জায়গায়ই যাস্ সব সময় চিঠি দিস্। তুইও দিস্ মক্‌বুল।

মুঙ্গেরে আস্‌তেই পাঁড়েজি দাদাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খাবার কিন্‌তে সেই যে গেল আর ফির্‌ল না।

বল্লাম গাড়ী যে ছেড়ে দিলে দাদাবাবু..

—দিক্। মুঙ্গেরে কাছাকাছিই ওর বাড়ী। অনেকদিন বাড়ী আসে নি।

—কি হবে তা'লে?

—একটা কুকার কিনে নেব।

দাদাবাবু কর্ক-স্ক্রু দিয়ে বোতল খোলে। তারপর শুয়ে ঘুমোয়। আমি এই ফাঁকে সিগারেটের টিন্ থেকে গোটা দুই তিন টানি।

কোনো জায়গায়ই দাদাবাবু দু' তিনদিনের বেশি জিরোতে পারে না। তিনদিনের দিন-ই বলে—তল্পি তল্পা গুটো' মকবুল। এ জায়গাটা ভারি ধুলো।

অন্য জায়গা আবার বেশি ঘেঞ্জি,—কোথাও বা লোক বেশি নেই বলে' ভালো লাগে না—বড্ড বেশি ফাঁকা।

কিন্তু সে-ফাঁকায় ফাঁকা মন ভরে' ওঠে একদম্। দাদাবাবু বল্লে—চমৎকার জায়গা। এখেনে কোনো বাড়ীতে আর গেষ্ট্ নয়, একেবারে তাঁবু ফেল্‌ব।

দাদাবাবু সত্যি সত্যিই তাঁবু ফেল্‌লে।

চারিদিকে পাহাড়,—ধারে নদী ত' নয়, মাটির একটা

রগ্। যেন মৃত্যুশয্যায় পড়ে' আছে। আহ্লাদির কথা মনে পড়ে।

দাদাবাবু কাঁধে বন্দুক ফেলে অনেক দূরে যায় পাখী মারতে। কোনো কোনো দিন আমিও যাই। মরা পাখীগুলি রাঁধে না, পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে দেয়। কিন্তু সবাইকে ত' সমান দেয় না দাদাবাবু। যে মেয়েটা বেশি পায়, রাত করে' চুপিচুপি আসে পয়সা চাইতে, বোতলের লাল পানি চাইতে।

আমি কত রাতে দূরে ঐ মরা নদীটার পারে শুয়ে ঘুমিয়েছি। আমার পাশে পাহাড়ী মেয়ে নয়—আহ্লাদি।

প্রচুর জ্যোৎস্না—বালির মাঝে ছুঁচ চেনা যায়। জ্যোৎস্নায় বসে' চিঠি লিখ্‌ছিলাম। মাকে নয় অবশ্যি—। লিখ্‌ছিলাম—কত জায়গা দেখ্‌লাম—তারই একটা ফর্দ্দ; পাড়েজি কেমন টাকা নিয়ে ভাগ্‌ল; দাদাবাবুর শরীর তেমন সারছে না, আমি বেশ টনকো হচ্ছি—এই সব। আমাকে রোজ ভোর বেলা দাদাবাবু পড়ায়—পাখী শিকার করি, একদিন একটা হরিণ পর্য্যন্ত মরেছিল আমারই গুলিতে। পরে লিখি—আমার কল্‌কাতা ফিরে যেতেই ইচ্ছা করে এখন। তোমার চিঠি পেলে খুব খুসি হব। টিমু-দা কেমন আছে?

দাদাবাবু বল্লে—কোথায় গেছ্‌লি?

—ইষ্টিশানে। চিঠি ফেল্‌তে।

আমাদের তাঁবু থেকে ইষ্টিশান মাইল তিনেকের পথ। গেঞ্জির ওপর দিয়ে কাপড়ের বাঁধ—গেঞ্জির তলায় পোষ্ট-কার্ডটা ফেলে দৌড়ে যাই সাঁ সাঁ করে'। যখন হাঁপাই, আস্তে আস্তে চলি।

নদীর পারে বালির ওপর শুই—ঘুম আসে না। দূরে গাছের পাতাগুলি আকাশের তারার সঙ্গে দুলে' দুলে' কথা কইতে চায়। আকাশের তারারাও কথা কইতে চায় নদীর জলের সঙ্গে। কি কথা কইতে চায় ওরা? আমি শুন্‌বার জন্য কান পেতে থাকি।

আস্‌মানীর চিঠি আসে না।

এই রাতে তাঁবু ছেড়ে দাদাবাবু কোথায় পালাল! ল্যাম্প্‌টা জলছে, গ্লাশটা পূরো খাওয়া হয় নি, বোতলের ছিপি খোলা—কোথায় দাদাবাবু? রাতে কি শিকারে বেরুল? বন্দুকটা ত' বাক্সেই আছে।

দাদাবাবু পাহাড়ের ধারে ধারে পায়চারি করছে। যাক্, বাকি গ্লাশটা আমারই জন্য রেখে গেছে বুঝি! ঘুম ভাঙ্‌তেই দাদাবাবু বল্লে—কাল রাতে কি খেয়েছিলি রে পাজী?

—তুমি যা খাও তেষ্টা পেলে।

—খবরদার, খাবি না আর!

দাদাবাবুর ওপর খবরদারি কর্‌বার কেউ নেই।

সে রাতে আমি নাকি খালি আমিনার নাম করেছি। দাদাবাবু নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। আমিনা? কে সে?

দাদাবাবু বল্লে—ইষ্টিশানে যেতে হবে রে কল্‌কাতার গাড়ী ধর্‌তে।

—আজই যাব নাকি? লাফিয়ে উঠ্‌লাম।

—যাওয়া নয়। এস্কর্ট্ করতে।

কাকে? আস্‌মানীরাই আস্‌বে বুঝি! কাল রাতে যে নতুন আরেকটা চিঠি লিখেছিলাম, ছিঁড়ে ফেল্লাম। কি দরকার?

আস্‌মানী নয়,—লম্বায় দাদাবাবুর মতনই ঢ্যাঙা, মাথায় একটুখানি কাপড় তোলা, সর্ব্বাঙ্গে শীর্ণতা ও ক্লান্তি। কে এ?

কেউ কারু মুখের দিকে চেয়ে প্রথম সন্দর্শনের পরিচিত হাসিটুকু হাস্‌লে না, একটি সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না। মেয়েটি ধীরে ধীরে দাদাবাবুর পেছনে আস্‌তে লাগল। দাদাবাবু বল্লে—মক্‌বুল, একটা টাঙা ঠিক কর্।

গাড়োয়ানের পাশে আমি—পেছনে দাদাবাবু আর মেয়েটি।

—কিছু মালপত্র আনো নি যে?

—ফিরতি বিকেলের গাড়ীতেই চলে' যাব।

—ফিরতি গাড়ী তো কাল ভোরে।

—তবে কাল ভোরেই।

আর কথা নেই। শুধু দাদাবাবুর হাতের ওপর মেয়েটির শিথিল হাতখানি আল্‌গোছে ছোঁয়া। টাঙা ঢিমিয়ে চলেছে।

—কি করে' জান্‌লে আমার ঠিকানা? এলে যে বড়!

—কল্‌কাতার চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছি।

—কি করবে এখন?

—সারাটা পথ তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি।

—চাকরী ছাড়্‌লে কেন?

—ভালো লাগ্‌ল না।

—আবার চুপচাপ। একমাইল পথ শেষ হল ঐ বালিয়াড়ির পর থেকে।

—মাধু।

—আমার নাম তোমার এখনো মনে আছে?

—কেন এলে তবে এখানে?

—তাই ভাব্‌ছি এখন। সত্যি বল্‌ছ বিকেলে গাড়ী নেই?

—থাকতে কি তোমার খুব কষ্ট হবে?

—ভীষণ!

তাঁবুতে এসে পৌছুলাম। বল্‌লাম—কে ইনি দাদাবাবু? তারপর ফিস্‌ফিস্ করে' বল্‌লাম—বৌদি?

—দূর! আস্‌মানীদের মিস্‌ট্রেস্।

তা হলে এর কাছে থেকে আস্‌মানীর খবর পাওয়া যেতে পারে—কেন সে আমার চিঠির জবাব দিচ্ছে না!

দাদাবাবু বল্‌লে—নদীতে নাইতে যাবে মাধু? আমার একটা কাপড় দি,—সেটা পরে' চান্ করবে খন।

মেয়েটি বল্‌লে—না।

বল্‌লাম—সে ভারি মজা দিদিমণি। জলে দু দিক থেকে কাপড় মেলে ধর্‌লেই মাছ আটকে যায়। আমি আর দাদাবাবু কতদিন ধরেছি। ধরাই সার, রাঁধা আর হয় নি।

দাদাবাবু বল্‌লে—তবে মকবুল বাল্‌তি ক'রে জল এনে দিক্, মাথাটা ধুয়ে ফেল।

তিন বাল্‌তি জল এনে ফেল্‌লাম। দাদাবাবু জল ঢেলে দিতে লাগ্‌ল। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে যেতেই দাদাবাবু বলে উঠ্‌ল—তোমার জ্বর মাধু?

—হ্যাঁ, একটু একটু হয়।

চুলটা মেয়েটিই মুছলে তারপর।

মেয়েটি বল্‌লে—আজকে আর কুকার নয়, ভাল করে' আমিই দুটো রেঁধে দিই।

দাদাবাবু বল্‌লে—তোমার শরীর ভাল নেই।

—না হয় আরো একটু খারাপ হল।—মকবুল!

এমন সুন্দর ক'রে আমাকে যেন কেউ ডাকে নি।—কি দিদিমণি?

দিদিমণি টাকা দেয়—ডিম মাংস কত কি আন্‌তে বলে, গরম মশলা লঙ্কা তেজপাতা পর্য্যন্ত।

দাদাবাবু বল্‌লে—তোমার জ্বর, তুমি কি খাবে?

—একটু সাবু জ্বাল দিয়ে নেব। তা ছাড়া আজ ত এম্‌নিই আমার উপোস।

—কেন?

—নিজের জন্ম দিনের তারিখটাও বুঝি মনে নেই এত ভুলো হয়েছ!

—মকবুল! মকবুল! দাদাবাবু গলা ফাটিয়ে ডাকতে লেগেছে। ফিরে এলাম। দাদাবাবু বল্‌লে—বাজার হবে না আজকে।

বাজার সত্যিই হোল না। জন্মদিনের উৎসব উপবাসের মধ্যে দিয়ে কাট্‌ল। এ কেমনতর? বেচারা আমিও না খেয়ে থাকব নাকি?

দিদিমণি বল্‌লে—যা পার, পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ো।

বাজারে পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে দেখা। তাকে বলে' দিলাম—আজ পয়সা নিতে তাঁবুতে যাস্ নে ছুঁড়ি। বুঝ্‌লি?

মেয়েটা বোঝে, হাসেও।

তাঁবুর বাইরে শুলাম। ভেতরে দু' কোণে দুটো ক্যাম্প খাট—দাদাবাবু আর দিদিমণি! ল্যাম্প নিবানো হয় না,—কান পেতে থাকি, কথাও শোনা যায় না একটি।

জ্যোৎস্না রাত কালো হয়ে আসছে। চেয়ে দেখি তাঁবু থেকে কে বেরুল—দাদাবাবু। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার গেল ভেতরে। তন্দ্রা এসেছিল, কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। দিদিমণি বেরিয়ে এসেছে। ওরও ঘুম আস্‌ছে না।

সকালবেলা টাঙায় ক'রে' ফের এলাম ইষ্টিশানে।

—তোমার জ্বর এখনো আছে?

—সকালবেলাই তো হয়।

তেম্‌নি হাতের ওপর হাত। তেম্‌নি কথা কইতে না-পারার অপরূপ অস্থিরতা।

ট্রেনে উঠে দিদিমণি বল্‌লে—তোমার জন্মদিন কবে, মক্‌বুল?

—আজই।

—তাই নাকি? দিদিমণি হাস্‌ল। তবে বাজারের বাকী পয়সাগুলো সব তোমার।

দাদাবাবু বল্‌লে—আর যদি দেখা না হয়!

—না হবে! দেখা হওয়াটাই ত' মিথ্যে।

—তবে আমার জন্মদিনের সম্মান কর কেন?

—তুমিও আমার মরণের দিনটার সম্মান রেখো।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

তারপর শুধু শক্ত কালো লোহার অচল কঠিন দুটো লাইন!

এক হপ্তাও যায় নি।

দাদাবাবু একটা টেলি নিয়ে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল—কালই কল্‌কাতা-মুখো রে মক্‌বুল। নে নে সব গুছিয়ে ফেল্।

কল্‌কাতা? বাঁচলুম যেন।

সন্ধ্যা উৎরে যেতেই হাওড়ায় এসে নাম্‌লাম। কল্‌কাতা নয় তো আস্‌মান।

বাড়ীতে কি যেন একটা গোলমাল হচ্ছে—দূর থেকে শুন্‌তে পাচ্ছি। কাছে এসেই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। আলোয় আলোয় ঝল্‌মল, ফুলে ফুলে আমের পাতায় গেট সাজানো, ছাতের ওপর হোগলার ছাউনি। সানাই বাজ্‌ছে।

—কোথায় এলাম দাদাবাবু?

—কেন, বাড়ীতে!

মা বল্লেন—ঠিক সময়ে এসেছিস্ যা হোক্। আমি তো ভেবে মর্‌ছি। এখুনি বর এসে পড়্‌বে। ওলো পটলি ওকে খবর দে, খোকা এসেছে।

মেয়ের দল কি ভেবে উলু দিয়ে উঠ্‌ল।

আমাকে বল্‌লেন—এ কে মক্‌বুল! বাঃ, দু' বছরে খাসা চেহারা হয়েছে ত'! চেনাই যাচ্ছে না। মাকে মনে আছে রে মক্‌বুল?

মাকে প্রণাম কর্‌লাম। বাবা এলেন—বাবাকেও।

খানিক বাদে একটা তুমুল উল্লাস উঠ্‌ল—বর এসেছে, বর এসেছে। শাঁখ, উলু, চীৎকার, গান—কত কি!

রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। এত চাকর থাক্‌তে অতিথি-চাকরকে হয় ত আজ আর দরকার হবে না। ছাই কল্‌কাতা! আমার সেই পাহাড়তলির শুক্‌নো মাঠটা ঢের ভালো—সেই কূয়োর ধার, সেই হিজল গাছের তলা, সেই মরা আহ্লাদি-নদীটা!—আর সেই পাহাড়ী-মেয়েটাও।

বাসি বিয়ের দুপুর। চাকরদের ব্যারাকের কোণের ঘরটা আজকাল পছন্দের। প্যাট্‌রাটা তেম্‌নি আছে—সেই পাটিগণিতটা, যার তলায় মখ্‌মলের চটি লুকানো ছিল,—টিনের কৌটোটা যেটা আমিনার কাছে জিম্মা রেখেছিলাম।

তখনো বাড়ীটা গিজ্‌গিজ্ কর্‌ছিল।

তবু কেন যে বারান্দাটায় এলাম ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে। মোটা থামটার আড়াল দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল বুঝি!

হঠাৎ কে যেন ছুটে এল। ছুটে মোটেই হয় ত নয়। না হোক্। এমন অসম্ভব কথা কে কবে ভেবেছে?

ওর সর্ব্বাঙ্গে নববধূর নবারুণ লজ্জা,—দুটি চোখে সেই পাহাড়-দেশের মায়া!

থামের পেছনে দাঁড়িয়ে বল্লে—কেমন আছ মক্‌বুল?

—ভাল আছি।

ভাবি, আসমানীর কোনো অঙ্ক ফের ভুল হয়ে গেল নাকি? না, সেই ফুল তুলে আনার হুকুম?

বল্‌লে—আজকে সবাই আমাকে প্রেজেন্ট্ দেবে। তুমি কিছুই দেবে না মকবুল?

—আমি কি দেব? কিই বা আছে—ছাড়া প্যাটরাটা?

আসমানী একটু হাস্‌লে। পরে আঁচলের তলা থেকে একটা সোনার হার বের করে' বল্‌লে—তুমি যদি এটা দাও, তা হলে ওরা একেবারে অবাক হয়ে যাবে। এটা আমারই জিনিস, তোমাকে দিলাম—তুমি এটা আবার আমাকে প্রেজেন্ট দিও। তুমি যদি কিছু না দাও তা হলে ওরা ঠাট্টা করবে।

কেন ঠাট্টা করবে বুঝি না। আমি ত' সামান্য একটা চাকর।

বল্‌লাম—দাও।

মনে কোনো দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল বুঝি। তাই হাত বাড়ালাম না।

আসমানী হারটা আমার পকেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে' গেল।

নিজের ঘরে এসে পড়েছি।

পেছন থেকে পছন্ এসে বল্‌লে—কি রে প্যাট্‌রা গুছোচ্ছিস্ যে! চল্‌লি?

চকচকে সোনার হারটাও বুঝি দেখে ফেলেছে।

—ওটা কি রে?

—সোনার হার, কিন্‌বি?

—কোথায় পেলি? চুরি করেছিস্?

—যে ক'রেই পাই না, নিবি কিনা বল্।

হারটা হাতে তুলে নিয়ে পছন্ বল্‌লে—কততে ছাড়বি?

—এই গোটা পঞ্চাশ—

—ঈঃ? পনেরোটা টাকা আছে, দেখ্—যদি হয়।

—দে, তাই। পনেরো টাকাই সই।

দ্বিধা করবার সময় নেই।

পাহাড়-তলির রেল-ভাড়া পনেরো টাকায় হবে? কে জানে? বেরিয়ে ত' পড়ি!

তখনো সানাই বেজে চলেছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

একটা কথা না বল্‌লেও চলে। বর অবশ্যি টিমু-দা'ই।

ব্যবধান

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আমার জীবন মাঝে প্রেয়সীর রূপে,
তুমি নারী, চুপে চুপে
এসেছ অর্গল খুলি' সস্মিত আননে।
সেইদিন কাননে কাননে
অজস্র কুসুম রাশি ফুটেছিল আমারই লাগিয়া ;
প্রিয়া মোর প্রিয়া !

সেই সুধাহাস্যধারা, সেই তব প্রেমঅর্ঘ্যহার
জীবন-বীণার তারে তুলেছিল কি নব ঝঙ্কার !
আজি এ নিশাতে
স্মরি তাই। সেই শুভ্র সুকোমল হাতে
আমার বেদনারাশি, আমার এ তুচ্ছ সুখভার
কেমনে নিয়েছ তুলি' মনে তাই পড়ে বার বার !

সেথা তুমি সঙ্গী মোর ; ওগো নারী, সরম-
কুণ্ঠিতা,
হে তরুণী, লাজাবগুণ্ঠিতা,
সেথা তব হৃদয়ের সুশুভ্র আসনে
আমারে দিয়েছ স্থান। প্রেম-আবরণে
আমার হৃদয়-দাহ, তৃষ্ণা, ক্লেশরাজি
সযতনে দূর করি' স্মিতমুখে দাঁড়ায়েছ আজি
আমার এ মানসের প্রতিমার বেশে ;
অতি ধীরে লাজ-হাসি হেসে।

রয়েছ হৃদয়ে। তবু, ভাবি তুমি আছ কত দূরে !
সেথা মোর চিত্ত মরে ঘুরে !
হাসি তব, আঁখি তব, তব নিত্যলীলাচঞ্চলতা,
প্রাণে শুধু জাগে সেই কথা।

রাণী, ওগো রাণী,
আজি মোর তপ্তভালে রাখ তব সিগ্ধ হস্তখানি,
এ ক্লিষ্ট আঁখির' 'পরে রাখ তব স্থির আঁখি-
তারা ;
কোথা তুমি ?
স্তব্ধ রাত্রি, শশী,—নিদ্রাহারা
নিঃশব্দে ঢলিয়া পড়ে অস্তাচল-পারে।
প্রিয়া মোর জাগো, জাগো হৃদয়ের গভীর
আঁধারে।

উপন্যাস

তৃতীয় ভাগ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৫

মোক্ষদার সৎকার ক'রে বাড়ি ফিরতে আমাদের অপরাহ্ন হ'য়ে গেল। তার মৃত্যুর সংবাদ আগেই এসে পৌঁছেছিল।

পরের বাড়ীর মেয়ের জন্য কেউ ডাক ছেড়ে কাঁদলে না বটে; কিন্তু সবাই গম্ভীর, সবাই ম্রিয়মাণ।

মোক্ষদার সঙ্গে আমার বিয়ে না হওয়াটা হয় ত' অনেকেই চাচ্ছিলেন; কিন্তু ব্যাপারটা এম্নি ভাবে পরিষ্কার হওয়াও কেউই যেন চান নি।

মা'র চোখ থেকে হয় ত' তার জন্যে দু-এক ফোঁটা জলও বার হয়েছিল; তাঁর একটি ছোট্ট শোক—ক্ষণিকের জন্য যে হয় নি, তাও নয়। গম্ভীর স্বভাব,—তাই মোক্ষদার বিষয় আর কিছু জানার আগ্রহ তাঁর রইল না।

কিন্তু কাকি-মা'র প্রশ্নের শেষ রহিল না। সে আমায় কিছু বল্লে কি না? তাদের বাড়ীর লোকেরা কি বল্লে? ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন তিনি বারম্বার ক'রে আমাকে প্রায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন।

কাকি-মা'র দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, মোক্ষদাই আমার পূর্ব্ব জন্মের পত্নী ছিল এবং তার সতীত্বের প্রভাবে শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে টেনে নিয়ে তার শেষের কাজ করিয়ে নিয়েছে। এই তত্ত্বটি তিনি নানা আলোচনায় প্রমাণ ক'রে মনে ভারি যেন সুখ পেতে লাগ্‌লেন।

আমি নির্ব্বাক হ'য়ে সব কথা শুন্‌ছিলুম কিন্তু তাও তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না—বল্‌ছিলেন, বল না কিরণ, এই কথা ঠিক নয়,—সত্যি নয়?

এই কথাগুলি মেনে নিলে যে ভবিষ্যতের পথে অনেক গোল দাঁড়ায়—সে কথা তাঁর মনে আসে নি। তাই তিনি যখন শেষ দিকে এসে বল্লেন, আর কি! এখন নীলিমার সঙ্গে তোমার বিয়ে যাতে হয়, তার জন্যে আমি কোমর বেঁধে লাগছি।

উত্তরে বল্লুম, তা আর কেমন ক'রে হয় কাকি-মা? আপনি ত' বলচেন যে, নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মোক্ষদা আমার পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রী ছিল, এ জন্মের মত সেও চলে গেল। এখন কি শাস্ত্র মতে আমাকে আর এক জন্মের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়?

কাকি-মা যেন ফাঁপরে পড়ে গেলেন। বল্লেন, কি জানি কিছুই ত' বুঝতে পারি নে।

কাকি-মা বুঝলেন যে, তাঁর নিজের মতবাদের একটা তীব্র খণ্ডন প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু তা' করা তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল; কারণ তাঁর মনের মধ্যে পূর্ব্বজন্ম-ঘটিত স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সম্পর্কে বিশ্বাসটি যেমন প্রিয়, তেমনি গভীর-নিহিত ছিল।

তিনি শেষে বল্লেন, কিন্তু বুঝতে পারি নে এমন হ'লেই বা পুরুষে কি করবে!

বল্লুম, তর্কচ্ছলে বল্‌চি কাকি-মা, কিছু মনে করো না—আচ্ছা আজ আমি যদি মারা যেতুম ত' মোক্ষদা কি চির-জীবন অবিবাহিত থাক্‌তো?

তিনি বল্লেন, কেন আমাদের দেশে সেকালে—এমন বাক্‌দত্তা মেয়েরা ত' কুমারীই থাক্‌তো শুনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু আজকাল?

তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন, আজকাল কি হয় ঠিক জানি নে।

আমি হাসতে লাগলুম—যাদের দেশের কোন ইতিহাস নেই—তাদের কাছে অতীতটা বড় পরিস্ফুট—ইচ্ছামত সব কথাই ইতিহাসের দোহাই দিয়ে বলা চলে; কিন্তু বর্ত্তমানটা একেবারে ঝাপসা।

বল্লুম, আমাদের মুনি-ঋষিরা যা ক'রে গেছেন—আজ তাকে পরিত্যাগ করি কেন কাকি-মা! আমাকেও চির-কুমার থাকতে দিতে আপনাদের কি আপত্তি?

কাকি-মা বল্লেন, পুরুষের বিয়ে হয় নি—এ ত' একটা গালাগালি।

উত্তরে বল্লুম, মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে—এও ত' শাস্ত্রের কঠোর অনুজ্ঞা! তা হ'লে জন্ম হ'লে মৃত্যু যেমন অবধারিত, বিয়েও কি তেমনি অবধারিত?

কাকি-মা রাগ ক'রে বল্লেন, নয় ত' কি?

আমি হাসতে লাগলুম।

কাকি-মা বল্লেন, আচ্ছা বেশ ত' দেখা যাবে এখন—কতদিন ভীষ্মদেব হ'য়ে থাকতে পার।... এ পাগলামি ত' তোমাদের নতুন নয়; তোমার কাকাও,—শুনেছি—একদিন রুদ্রাক্ষ গলায় দিয়ে গেরুয়া প'রে হরিদ্বার রওনা হচ্ছিলেন।... আমার হাসি পায় সেই কথা শুনে!... এ মানুষ বিয়ে না ক'রে কেমন ক'রে থাক্‌তো!

বল্লুম, কিন্তু কাকি-মা, যতই কেন দোষ দাও না। আজো আমি কাকার মধ্যে পরিষ্কার একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পাই। কাকার পক্ষে যে-কোন দিন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়া, খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

কাকি-মা এবার হাসলেন, সে কথা খুব ঠিক বাপু; এমন নির্ব্বিরোধী মানুষ কমই আছে।

এমন সময় নির্ব্বিরোধী মানুষটি ঘরে এসে একখানা লম্বা খাম আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, পুরী থেকে বদলি ক'রে দিয়েছে।

সেখানে তখন বাজ পড়লেও বোধ করি তত আশ্চর্য্য হ'তাম না। হঠাৎ মনে হলো, কিসে যেন ধাক্কা লেগে পাঁজরের হাড় ক-খানা খুলে গেছে—বুকের মধ্যে সবই খালি হ'য়ে গেলো!

বুকের ব্যথা লুকিয়ে রেখে দিনটা কোন রকমে কাটলো—রাত্রে আর কিছুতে ঘুম হয় না! শুয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই; কি করলে যে সুখ পাই তাও বুঝতে পারি নে।

মনে হলো মনের সব কথা যদি কাউকে খুলে বলতে পাই ত' বেশ হয়। কাগজ-কলম নিয়ে একটা মস্ত চিঠি লিখে ফেল্‌লুম।

লিখলুম, নীলমণি, আমায় বদলি করে দিয়েছে! একি ভাগ্য-দেবতার চক্রান্ত নয়? একমাস শেষ হ'তে এখনো দশদিন বাকি কিন্তু কিছুতেই আমার মন টি'কে না, কিন্তু তোমার কাছে কথা দিয়ে এসেছি একমাসের আগে যাবো না।

শেষে লিখলুম, বিয়ে যখন হলোই না তখন দু' পাঁচ দিন আগে গেলে ক্ষতি কি? হাই কোর্টের হুকুমও ত' ফেরে—তবে এই কঠিন নিষেধ কি ফিরবে না!

চিঠি ডাকে দিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষার্থ দিনগুলো কেটে গেলো। নীলমণি চিঠির কোন জবাব দিলে না।

শেষে একদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে পুরীর উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওনা হ'য়ে পড়লুম।

৬

জোর হাওয়াতে স্রোতের সঙ্গে পালভরে যেতে যেতে নৌকা যেমন তল-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে—তেমনি হলো আমার। নীলমণির সঙ্গে কি মন নিয়েই চ'লেছিলুম—দেখা করতে! গাড়ী-বারাণ্ডার উপর প্রকাণ্ড ইজি চেয়ারে ঢিলে-পাজামা পরা এক ইঙ্গ-বাবুর পা দুখানা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম—বহু দূরে। একি কাণ্ড! এ আবার কিরে!

মনে হলো ফিরে যাই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে করতে লাগলুম যে, নীলমণিদের ত' কোন পুরুষ আত্মীয়ের কথা কোনদিন শুনি নি। হয় ত' বা কেউ বন্ধু-বান্ধব এসে থাকবেন। আবার একটু-একটু ক'রে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, বিরজা দত্ত—একটা জানলায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের শোভা দেখ্‌চেন।

মনে হলো ভুল হয়েছে; কিন্তু ভুল হয় নি।

বাড়ীর কাছা-কাছি হ'তেই তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন, উপরে চ'লে এসো—কবে এলে তুমি?

উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখলুম—বাড়ীখানাতে নূতন চূণকাম করা হয়েছে। অনেক আসবাব-পত্র! কিন্তু কই! তারা কই?

ততক্ষণে মিসেস্ দত্ত এগিয়ে এসে আমায় নিয়ে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, দেখুন, একজন নতুন লোক, চিনতে পারেন কি?

একি হরিলাল বাবু! জীর্ণ-শীর্ণ! নাকটা হয়েছে খড়্গের মত, চোখ-দুটো শুক তারার মত ঝক্‌-ঝক্ করচে!

আপনি! ব'লে তাঁকে প্রণাম করলুম।

তিনি স্মিতহাস্যে বল্লেন, ডাক প'ড়েছে কিরণ,—তাই আজ স্বর্গদ্বারে!

সামান্য উত্তেজনাতে তাঁর কাশি আরম্ভ হয়ে গেল! কাশতে কাশতে এক ঝলক রক্তও উঠলো।

ঘণ্টা খানেক পরে তিনি একটু সুস্থ বোধ ক'রে বল্লেন, এ গ্যালপিং, বেশি দিন ভোগাবে না, এই যা ভরসা!

মৃত্যুর অচির-সম্ভাবনা যেন রাত্রির অন্ধকারের মত হরিলালের মনের উপর ঘনীভূত হ'য়ে জড়িয়ে আস্‌ছিল;—সেটাকে ফুৎকারে সরিয়ে দিয়ে মনটাকে লঘু ক'রে তোলার জন্য তিনি নানা কথার অবতারণা করলেন।

বল্‌লেন, কবে এলে?

আজই।

বেশ। বিয়ে-থা সব ভালয় ভালয় হয়ে গেছে?

না।

তিনি চিন্তাকুল হয়ে উঠে বল্লেন, কেন, হলো না কেন?

বল্লুম, পাত্রী হঠাৎ মারা গেছে।

ইস্, তাই ত' শুভ-কাজে এমন বাধা হলো!

বিরজা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল মেয়েটির?

জর-বিকার।

তিনি অনুযোগের সুরে বল্লেন, ঐ ত' দোষ,—পাড়া-গাঁয়ের।

মৃদু হেসে হরিলাল বল্লেন, আর শহরে বুঝি মানুষে জর-বিকারে মরে না?

গম্ভীর ভাবে বিরজা বল্লেন, অত নয়।

হরিলাল হাস্‌তে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিরজা বল্লেন, ওঁর অসুখ হওয়া পর্য্যন্ত আমি বল্‌চি পুরীতে চলুন, পুরীতে চলুন, তা ওঁর আর আসা ঘটেই ওঠে না।...হঠাৎ ইলার চিঠি পেলুম যে সায়েব বিলেত চলে গেলেন—আর এই বাড়ীটা খালি হয়েছে—তখুনি আমি মাথা খোড় খুঁড়ে ওঁকে রাজি ক'রে নিয়ে এলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ জিঠানি বিলেত চ'লে গেলেন যে?

বিরজা একটু ঢোঁক গিলে বল্লেন, তাঁর ত' সেই লিভারের দোষ আছেই—ডাক্তার-সায়েব তাঁকে কিছুদিন সমুদ্রে থাকতে বলেছিলেন—তা' এ বেশ হলো, রথ দেখা, কলা বেচা!

বল্লুম, সায়েব একা গেলেন? ইলা?

নাঃ, সে যায় নি। বলে' বিরজা একটি ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন।

কেমন যেন বল্‌তে ইচ্ছা হলো, সায়েবকে একা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে? কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে নিলুম।

কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে সব কথা ফুরিয়ে গিয়ে চুপ-চাপ হ'য়ে গেল।

আমার মনে তখন বারবার ক'রে একটি কথা উ'ঠতে লাগ্‌লো—এ বাড়ীর তাঁরা কোথায় গেলেন? কিন্তু সে প্রশ্ন করা সাহসে আমার কুলিয়ে উঠ্‌ল না।

শেষে, উঠে দাঁড়িয়ে বল্লুম, আজ তবে আসি, কাল আবার আস্‌বো।

হরিলাল বল্লেন, কিরণ, অনেকখানি তোমার ভরসাতেই এখেনে আসা।

বল্‌লুম, কিন্তু একটা গোল দাঁড়িয়েছে, আমি বদলির চিঠি পেয়েছি।

হরিলাল উঠে ব'সে বল্লেন, এঁ, তুমি বদলি হয়েছ? তার পর তিনি অজস্র কাশতে কাশতে চেয়ারের উপর নেতিয়ে প'ড়লেন।

* * *

* *

*

হরিলালবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে মনে হলো, ইলার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি গে; কিন্তু পা দুটো কিছুতেই সে দিকে যাবে না। একটু এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ব'সে পড়লাম।

সমুদ্রের ঢেউ একের পর এক ক'রে এসে—তট-টা ফেণায় ফেণায় ভরিয়ে দিচ্ছে। মনে হ'লো, সেই প্রথম দিনের কথা। মনে হলো নীলমণির লঘু-চঞ্চল হাসির লহরী। মনে হলো—তার সহজ সুন্দর আলাপের ভঙ্গীখানি!

বুকের মধ্যে একটা নিবিড় ব্যথার আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে মুখে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটু নাম! ত্রস্ত হ'য়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম—যদি কেউ শুনতে পেয়ে থাকে!

কাছে একখানা বেঞ্চ ছিল তার উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে চোখ দুটো বুজে ভাবলুম—কারুর কথা ভাবব না আজ।

বোজা চোখে দেখলুম—কেবল অন্ধকার অন্ধকার;—তার শেষ নেই, সীমা নেই! খানিক পরে দেখলুম সমস্ত অন্ধকার যেন একটা বিন্দুর চারিদিকে বিপুল বেগে ঘুরচে।

সেই ঘূর্ণিপাক দেখতে দেখতে আমার মাথার মধ্যেও সব বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে লাগলো। সেই ঘোরার মধ্যে হঠাৎ যেন আমি নিজেই কোথায় তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেলুম।

এমন আত্মহারা হ'য়ে কতক্ষণ ছিলুম জানি নে; যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলুম যে অন্ধকারের কেন্দ্রটি ক্রমে উজ্জ্বল হচ্চে। সেই আলোক বিন্দুটির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে—তাতে ফুটে উঠলো একখানি অতিশয় পরিচিত মুখের সকরুণ স্নিগ্ধ হাসি!

তখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ব'সে প'ড়ে বল্লুম, এ কি পাগল হব না কি!

একটা শান্ত তৃপ্তির ঘুমে যেন আমার সমস্ত দেহ-মন নিমেষে ছেয়ে এলো। গায়ের চাদরখানা পাকিয়ে গোল ক'রে বালিশের মত ক'রে নিয়ে তার উপর মাথা রেখেই বুঝলুম যে, আমি ঘুমিয়ে পড়চি। মনে হলো,সে ঘুম হয় ত' আর ভাঙ্গবে না। তাতেই বা ক্ষতি কি?

—ক্রমশ

রমঁ্যা রলাঁ

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনুদিত]

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রিস্তফ্ এবং অটো সৃষ্টির কার্য্যে লাগিয়া গেল। কি তাদের উৎসাহ! কি ধৈর্য্য! যেন মৌমাছিকেও হারাইয়া দেয়। অতি সামান্য স্মৃতির টুকরা লইয়া তাহারা নিজেদের এবং তাহাদের বন্ধুত্বের কত কাল্পনিক ছবি রচনা করিয়া তুলিল। সপ্তাহ ধরিয়া এই ভাবে দুজনে দুজনকে কল্পলোকে আরতি করিত এবং বারবার দেখা হইলে সত্য এবং কল্পনার মধ্যে প্রভেদটা প্রকট হইয়া উঠিলেও তাহারা যেন দেখিয়াও দেখিত না। তাহাদের ইচ্ছার ছাঁচে সব জিনিষকে ঢালাই করিয়া লওয়াই তাহাদের প্রধান কাজ।

উভয়ের সখ্যে উভয়ে গর্ব্বিত। দুজনের প্রকৃতিগত বৈষম্যই দুজনকে যেন বেশী করিয়া টানিতেছে। অটোর চেয়ে সুন্দর ক্রিস্তফের কাছে আর যেন কিছুই নাই। তার সুগঠিত হাত, সুন্দর চুল, স্নিগ্ধ মুখশ্রী, সলজ্জ বাক্যালাপ, তার ব্যবহারের সৌজন্য, তার বেশ ভূষার পারিপাট্য ক্রিস্তফ্‌কে মুগ্ধ করিত।

অটো তেমনি ক্রিস্তফের উদ্বেলিত পৌরুষ, শক্তি ও স্বাধীন গতিবিধি দেখিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। হুকুম মানিয়া চলা যেন তার জন্মগত অভ্যাস ও উত্তরাধিকার। সেই জন্যই ক্রিস্তফের মত বন্ধুর প্রতি তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ, কারণ এই মানুষটি বাঁধা নিয়মকানুনের কোন তোয়াক্কাই রাখে না। ক্রিস্তফ্ যখন শহরের যত হোমরা-চোমরা এমন কি গ্র্যাণ্ড ডিউককে পর্য্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, অটো কেমন একটা ভয় মিশ্রিত আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত। ক্রিস্তফ্ বুঝিত যে, কোন্ জিনিষটি তার বন্ধুকে মুগ্ধ করিতেছে। এবং সে তার মেজাজটা বেশ বাড়াবাড়ি রকমে গরম করিয়া দেখাইত। একজন মস্ত মাতব্বর সমাজদ্রোহীর মত সে রাষ্ট্র এবং সমাজের যত বিধিব্যবস্থা যেন চুরমার করিয়া দিতে চাহিত। অটো যতটা দমিয়া যাইত তার চেয়ে বেশী খুশী হইত। ক্রিস্তফের বিদ্রোহের সুরে সে সুর মিলাইতে চেষ্টা

করিত কিন্তু সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ভাবে দেখিত, কেহ শুনিয়া ফেলিল কি না।

দুজনে বেড়াইতে বাহির হইলে মাঠ ঘাটের সীমানায় "প্রবেশ নিষেধ" লেখা চোখে পড়িলেই ক্রিস্তফ্ নিষেধ অমান্য করিত। লোকের বাগানের ফল পাড়িত। ধরা পড়িবার ভয়ে অটো অস্থির হইত অথচ বেশ একটা মজা যে বোধ করিত না এমন নয়! এই ভাবে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া অটো ভাবিত সে যেন একটা মস্ত বীরত্ব করিয়া আসিয়াছে। ক্রিস্তফ্‌কে তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয় অটোর মনে জাগিত। সে এমন একটি বন্ধু পাইয়াছে যার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেই যথেষ্ট। এই আনুগত্য অটোর মজ্জাগত, সুতরাং তাহার মতামত কি, এটা জানিতে ক্রিস্তফ্ এতটুকু মাথা ঘামাইত না। সে যত কিছু মতলব আগে থাকিতেই ঠিক করিত এবং অটোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন ভাবে ব্যবস্থা করিত যেন সে বিষয়ে কোন তর্ক উঠিতেই পারে না। সে যেন তাহারই সপরিবারের একটি প্রতিপালিত জীব। অটো মোটামুটি সব মানিয়া লইত। কিন্তু একদিন ক্রিস্তফ্ অটোর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া 'কালনেমীর লঙ্কা' ভাগ করিতে করিতে বলিয়া বসিল—আমি একটা প্রকাণ্ড থিয়েটার তৈরী করব—তোর সামান্য যা কিছু আছে ঐ কাজে লাগিয়ে দেখ্‌ব, গড়ে তুল্‌তে পারি কিনা।"

শুনিয়া অটোর ত চক্ষুস্থির! কিন্তু ক্রিস্তফের চড়া গলার সামনে প্রতিবাদ করিবার মত সাহস তার কোথায়! সুতরাং সে মানিয়া লইল যে, তার বাবা দোকানদারী করিয়া যে টাকা জমাইয়াছে, নাট্য-কলার উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ করাই তার চরম সার্থকতা। এই ব্যবস্থাটা যে অটোর পছন্দমত না হইতেও পারে সে কথা একবারও ক্রিস্তফের মনে আসিল না। যথেচ্ছাচার তার এমনি প্রকৃতিগত যে, তার বন্ধুর ইচ্ছা যে একটু অন্যরকম হইতে পারে তাহা সে ভাবিতেই পারিত না। অবশ্য সত্যই যদি অটো নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ করিতে পারিত ক্রিস্তফ্ তখনই তাহার খেয়াল ছাড়িয়া দিত। বন্ধুর জন্য ত্যাগ করিতে সে উন্মুখ, তাহার জন্য জীবন বিপন্ন করিবার সুযোগ সে খুঁজিয়া বেড়াইত। তাহার গভীর বন্ধুত্বের একটা পরীক্ষা হইয়া যাক্ ইহা সে সমস্ত প্রাণ দিয়া আকাঙ্ক্ষা করিত। বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রিস্তফ্ চাহিত যে, একটা বড় রকমের বিপদ আসে এবং সে বুক দিয়া তাহার বন্ধুকে রক্ষা করে। অটোর জন্য মরাও বোধ হয় তার পক্ষে কঠিন নয়। হাটিতে চলিতে অটোকে সে নির্ভর দিতে ছুটিত। অটো যেন একটি তরুণী বালিকা—সে বেশী শ্রান্ত হইল বা তাহার ঠাণ্ডা লাগিল কিনা ইহা ভাবিয়াই ক্রিস্তফ্ অস্থির। দুজনে গাছতলায় বসিলে তাহার কোটটি দিয়া অটোকে ঢাকিত। অটোর পোষাক হাটিবার সময় সে বহিত। প্রেমিকের মত সমস্ত চোখ দিয়া সে যেন অটোকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিত।

সত্যই সে প্রেমে পড়িয়াছে! অথচ ক্রিস্তফ্ তাহা জানিত না। কিন্তু সময় সময় সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিত—যেমন তাহাদের বন্ধুত্বের প্রথম দিনে সে অনুভব করিয়া ছিল। তা'র মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত। সে ভয় পাইত। আপনা হইতেই দুজনে একটু তফাৎ হইয়া যাইত অথবা একজন যেন পিছাইয়া পড়িত। যেন তাহারা ঝোপের মধ্যে কালজাম বা কিছু একটা খুঁজিতেছে। অথচ কেন যে তা'রা এমন উতলা হইয়াছে বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু তা'দের চিঠিতে আবেগের মাত্রা ভীষণ বাড়িয়া যাইত। চিঠির মধ্যে বাস্তব কিছু আনিয়া প্রতিবাদ করিবে এমন আশঙ্কা নাই। তাদের কল্পনাকে প্রতিহত করিতে বা দমাইয়া দিতে এ ক্ষেত্রে কিছুই ছিল না। গদ্যকাব্যের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস মিশাইয়া সপ্তাহে দুতিনবার তাহারা চিঠি লিখিত। সত্য যাহা ঘটিতেছে তাহার উল্লেখমাত্রও তাহারা করিত না। ভবিষ্যদ্দর্শী ভাবুকদের মত তাহারা বড় বড় সমস্যার অবতারণা করিত। এবং প্রদীপ্ত উৎসাহ হইতে গভীর অবসাদে তাহাদের সুর নামিয়া যাইত। চিঠির মধ্যে—"আমার প্রিয়তম, আমার আশা, আমার জীবনের আশীর্ব্বাদ" প্রভৃতির ছড়াছড়ি হইত এবং 'আত্মা' কথাটাকে যে কত রকমে জবাই হইত তাহার ঠিকঠিকানা

নাই! গভীর নৈরাশ্যে, ভীষণ কালরঙে দুজনের জীবনের কাল্পনিক দুঃখের চিত্র চিঠিতে আঁকিয়া চলিত এবং একজনের দুঃখের কাহিনী অন্যকে শুনাইয়া ফেলিয়া যে নিষ্ঠুরতা করিয়াছে তাহার শোকে মুহ্যমান হইত। ক্রিস্‌তফ্‌ লিখিতেছে—

"প্রিয়তম আমার, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি বলে আমার যে কি দুঃখ তা কি করে বোঝাব। তুমি কষ্ট পাবে এটা আমি সহ্য করতে পারব না। না, তা হবে না—আমি হতে দোব না। (এই কথা গুলি এমন জোরে দাগ দিল যে, প্রায় কাগজ ছিঁড়িয়া যায়!) তুমি যদি কষ্ট পাও তাহলে আমি বাঁচবার প্রেরণা ও শক্তি কোথা থেকে পাব? আমার সব সুখ একমাত্র তোমাতে—তুমি সুখী হও, সমস্ত দুঃখের বোঝা আমি একা আনন্দে আমার ঘাড়ে নেব। তুমি শুধু আমার কথা ভেব, আমাকে একটু ভালবেসো। ভালবাসা পাওয়াটা আমার কত দরকার তুমি জান না। তোমার ভালবাসা থেকে আমি যেন প্রাণ পাই। আমার হৃদয়ের মধ্যে ভীষণ শীত ও হীমবায়ু বয়ে যাচ্ছে। আমি কি রকম কাঁপছি তুমি জান কি? তোমার আত্মাকে আমি আলিঙ্গন করছি।"

জবাবে অটো লিখিতেছে—"আমার স্বপ্ন তোমার স্বপ্নকে চুম্বন করছে।"

ক্রিস্‌তফ্‌ লিখিতেছে—"তোমার মুখখানি আমার দুটি হাতের মধ্যে ধরেছি। আমার ঠোঁট দিয়ে যা' করতে পারি নি—যা' করব না, তা আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে করছি। আমার ভালবাসা যতখানি, আমার চুম্বনও ততখানি। ভাব ত কেমন?"

অটো যেন বিশ্বাস করিতেছে এমন ভাব দেখাইত। "আমি তোমাকে যতটা ভালবাসি তুমি কি আমায় ততখানি বাসতে পার?"

—"ততখানি! তার চেয়ে শতগুণ, সহস্রগুণ। তুমি বুঝতে পার না? বল' তোমার বোঝাবার জন্য কি করব।"

দীর্ঘশ্বাসের ছন্দে অটো জবাব দিতেছে—"কি মিষ্টি এই বন্ধুত্ব আমাদের! ইতিহাসে কি এর জোড়া আছে? আমাদের এই বন্ধুত্ব স্বপ্নের মত স্নিগ্ধ, নূতন। হায়, এ যদি শুকিয়ে যায়—তুমি যদি আর না আমায় ভালবাস!

—"প্রিয়তম, তুমি কি এতই নির্কোধ? ক্ষমা কর ভাই, তোমার এই ভয় জিনিষটা আমায় ভারি বিক্ষিপ্ত করে। আমি তোমাকে ভালবাসব না এ কথা তুমি ভাবতে পারলে? আমার কাছে বাঁচা মানেই ভালবাসা। আমার ভালবাসার কাছে মৃত্যু পরাজাতি। এমন কি তুমিও যদি এটি নষ্ট করতে চেষ্টা কর তাহলেও পারবে না। তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, আমার হৃদয় ভেঙ্গে দাও তবুও আমি তোমার ভালবাসার জন্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে মরবো। সুতরাং কাপুরুষের মত এই সব সন্দেহ নিয়ে উতলা হয়ো না—আর আমাকে বিরক্ত কর না।"

কিন্তু এক হপ্তার পরে ক্রিস্‌তফ্‌ নিজে লিখিতেছে—"তিনদিন হয়ে গেল তোমার কাছ থেকে একটি কথাও এল না! আমি ভাবছি, আমায় ভুলে গেলে কি? ভাবতেও আমার রক্ত জমে যায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুলেছ। হ্যাঁ সেই দিনই তোমাকে কেমন উন্মনা দেখাচ্ছিল। তুমি আর আমাকে ভালবাস না। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কিন্তু শোন যদি ভুলে যাও, যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তোমাকে খুন করব!"

কাতর স্বরে অটো জবাব দিতেছে—প্রাণের বন্ধু আমার, এমন অবিচার তুমি করতে পারলে! আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। এ রকম ব্যাভার তোমার কাছে আমি প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু তোমার যা' খুশী তাই করতে পার। তুমি যদি আমার হৃদয়টা ভেঙ্গেও দাও তবু এতটুকু একটু প্রাণের শিখা থাকবেই তোমার আরতি করবার জন্য! . . .

ক্রিস্‌তফ্‌ লিখিতেছে—"হা ভগবান! আমি কি পাষণ্ড, আমার বন্ধুকে কাঁদিয়েছি! অপমানের বজ্রাঘাত হোক্‌ আমার মাথায়। আঘাত কর, আমায় দু'পায়ে মাড়াও, আমি নরাধম, আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত নই। . . . .

এমনি ভাবে পত্রালাপ চলিত। তার উপর ঠিকানা

লেখা হইত প্রতিবার নতুন ছাঁদে। টিকিটমারা হইত কখন উল্টাইয়া কখনও তুলায়, কখনও এমন একটা জায়গায় যে অন্ত চিঠি হইতে চকিতে চিনিয়া লওয়া যাইত। এই সব ছেলেমানুষির লুকোচুরি প্রেমের রহস্তে যেন মাথামাখি।

ক্রিস্তফ্ একদিন বাজনা শিখাইয়া ফিরিতেছে, হঠাৎ দেখিল অটো তার বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরিতেছে। দুজনের যেন অনেক দিনের চেনাশুনা! হাসিয়া নাচিয়া দু'জনে চলিয়াছে। ক্রিস্তফ্ ঈর্ষায় নীল হইয়া গেল। এবং যতক্ষণ না দুজনে মোড় ফিরিয়া অন্ত রাস্তায় গেল সে দূর হইতে তাদের দেখিতে লাগিল। অথচ তাহারা দেখে নাই।

ক্রিস্তফ বাড়ী ফিরিল। একটা কাল মেঘ তার মনের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—চারিদিক অন্ধকার!

পরের রবিবারে দুই বন্ধুতে দেখা। ক্রিস্তফ্ কথাই বলে না; আধঘণ্টা বেড়াইবার পর রুদ্ধ কণ্ঠে ক্রিস্তফ্ বলিল—বুধবার তোমাকে অমুক রাস্তায় দেখেছি।

অটো একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল এবং লাল হইয়া উঠিল।—তুমি একা ছিলে না?

—না, একজন আমার সঙ্গে ছিল।

ক্রিস্তফ্ ঢোক গিলিয়া রাগটা থামাইতে চেষ্টা করিল। এবং যেন উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সঙ্গে কে ছিল সে দিন?

—আমার এক জ্ঞাতি ভাই—ফ্রান্‌জ্

—ও! কই তার কথা ত কখনও আমাকে বল নি?

—সে ও-পাড়ায় থাকে।

—তোমার সঙ্গে কি প্রায়ই দেখা হয়?

—সে মাঝে মাঝে আসে।

—তুমি কি মধ্যে মধ্যে তাদের বাড়ী গিয়ে থাক?

—হাঁ

ক্রিস্তফ্ শুধু একটা চাপা আর্ত্তনাদ করিল। অটো কথাটা ঘুরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। একটা পাখী গাছের ডাল ঠোক্‌রাইতেছে—সেটা দেখাইল। কিছুক্ষণ অন্ত কথা চলিল। দশ মিনিট পরে ক্রিস্তফ্ আবার বলিয়া উঠিল—

—ওর সঙ্গে তোমার কি ভাব আছে?

অটো বেশ জানিত কার কথা জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তবু বলিল—কার সঙ্গে?

—ঐ ফ্রান্‌জের সঙ্গে?

—হাঁ, ভাব আছে। কেন?

—নাঃ, কিছু নয়! বলিয়া ক্রিস্তফ্ থামিল। অটো ফ্রান্‌জ্‌কে যে বিশেষ পছন্দ করিত তা নয়, কারণ সে তাকে বেজায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত; তবু কেমন একটা প্রকৃতিগত দুষ্টামির বশে অটো বলিয়া বসিল—ও ভারি চমৎকার!

ক্রিস্তফ্ জানিত কার কথা বলিতেছে। তবু জিজ্ঞাসা করিল—কে?—এই ফ্রান্‌জ্?

ক্রিস্তফ্ কি বলে অটো শুনিতেছে, দেখাইতেছিল কিন্তু সে যেন শুনিতেই পায় নাই। সে গাছ হইতে একটা ডাল ভাঙ্গিয়া একটা ছড়ি করিতে ব্যস্ত! অটো বলিয়া চলিল—ভারি মজার লোক সে। কত অদ্ভুত গল্পই সে জানে!

ক্রিস্তফ্ যেন অন্যমনস্ক হইয়া শিস দিতে লাগিল। অটো আবার নতুন করিয়া আকার দিতে গেল।

—আর কি চালাক সে! . . . তার চালচলনও উঁচু দরের।

ক্রিস্তফ্ শুধু গা ঝাড়া দিল। যেন বলিতে চায় —ও লোকটার কথা শুনে কি আমি রাজা হ'ব? মজা পাইয়া অটো কথাটা আরও চালাইতেছিল, হঠাৎ ক্রিস্তফ্ সব থামাইয়া দিল—চলো ঐখানে ছুটে যাই।

সমস্ত বিকাল ঐ বিষয়ে আর কথা হইল না। ভিতরে ভিতরে আড়ষ্টতা যতই বাড়িতেছিল, শিষ্টাচারের আড়ম্বর তেমনি বাড়িয়া চলিল। ক্রিস্তফের পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার মুখে যেন কথা ফুটিতে ছিল না। শেষে নিজেকে আর সে সম্বরণ করিতে পারিল না; পথের মাঝে সে হঠাৎ অটোর দিকে ফিরিল—

সে খানিকটা পিছাইয়া ছিল, বিষম জোরে তার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ক্রিস্‌তফ্‌ বলিয়া উঠিল—

দেখ অটো! ফ্রান্‌জের সঙ্গে তোমার অতটা ভাব হতে আমি দেব না, কারণ তুমি আমার বন্ধু, আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে তুমি পাবে না। তুমি জান তুমিই আমার সব। তুমি গেলে আমার আর কিছুই থাকবে না—থাক্‌বে শুধু মৃত্যু। আমি কি করব জানি না—আমি নিজেকে মার্‌ব—এবং তোমাকেও—না না আমায় ক্ষমা করো! . . .”

ক্রিস্‌তফের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তার বেদনার সেই একান্ত সরলতায়, তার ভীষণ চাপা গর্জ্জনে অটো যেমন কষ্ট তেমন ভয়ও পাইল। তাড়াতাড়ি সে শপথ করিয়া বসিল যে, সে ক্রিস্‌তফ্‌ ছাড়া কাহাঁকেও ভাল বাসে না—বাসিবেও না; ফ্রান্‌জ্‌ তার কাছে প্রায় সাধারণ পরিচিত ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি ক্রিস্‌তফ্‌ চায় তাহা হইলে ফ্রান্‌জের সঙ্গে আর সে দেখা করিবে না।

ক্রিস্‌তফ্‌ যেন অটোর কথাগুলো গিলিতে লাগিল, তার ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তার নিঃশ্বাস তার হাসি আবার সহজ হইল। অটোকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে সে যেন ভাবিয়া পায় না। এমন একটা কাণ্ড করিয়াছে বলিয়া তার লজ্জা হইতেছিল অথচ তার মনের উপরকার একটা মস্ত বোঝা যেন নামিয়া গিয়াছে। দুজনের হাত ধরিয়া দুজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহারা যেমন সুখী তেমনই লজ্জিত, মুখে কথা নাই! ক্রমশ কথা ফুটিল, স্ফূর্ত্তির তোড় ছুটিল। মিলনের অনুভূতি যেন পূর্ব্বেকার অপেক্ষা গাঢ়তর লইল।

কিন্তু এই খানেই গোলমালের শেষ হইল না। অটো বুঝিয়াছে যে, ক্রিস্‌তফ্‌ এক জায়গায় তার কাছে কাবু; তার শক্তির অপব্যবহার সে করিয়া চলিল। ক্রিস্‌তফের যে জায়গায় চোট্‌ লাগে সেইখানেই আঘাত করিবার লোভ তাকে পাইয়া বসিল, তাকে রাগাইতে যে আনন্দ তা নয় বরং অশান্তি খুবই বাড়ে—তবু ক্রিস্‌তফের উপর নানা অত্যাচার করিয়া অটো তার শক্তিটা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে আসলে খারাপ নয়, শুধু তার মনটা ছিল খেলোয়ার মেয়ের মত।

প্রতিজ্ঞা যতই করুক অটো অন্য বন্ধু ও ফ্রান্‌জের সঙ্গে গলাগলি করিয়া বেড়াইতে আবার সুরু করিল। এবং তাহাদের সহিত খুব হল্লা করিয়া ন্যাকামীর হাসিতে ক্রিস্‌তফ্‌কে জ্বালাইতে লাগিল। ক্রিস্‌তফ্‌ যখন তাহাকে গালি দিত সে হাসিয়া সব উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত কিন্তু যেই দেখিত যে, ক্রোধে ক্রিস্‌তফের চক্ষু রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে বা তাহার ঠোঁটদুটি কাঁপিতেছে, তাহার সমস্ত উচ্ছ্বাস থামিয়া যাইত এবং ভীতকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিত যে, সে এরূপ কাজ আর কখনও করিবে না কিন্তু পরদিনেই আবার সেই একই কাজ। ভীষণ ক্রোধে ক্রিস্‌তফ্‌ তাহাকে লিখিত—

—পাষণ্ড! তোর কথা আমি আর কখনও যেন শুন্‌তে পাই না! আমি তোকে চিনি না! তুই যমালয়ে যা—তোকে যেন কুকুরে খায়! . . .

উত্তরে পূর্ব্বের মতই অটো দু’ একটা অশ্রুমাখা কথা বা তাহার চিরবন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ একটা ফুল পাঠাইয়া দিত। বাস্‌, ইহাতেই ক্রিস্‌তফ্‌ অনুতাপে এতটুকু হইয়া যাইত এবং লিখিত—

অন্তরের দেবতা, আমি একেবারে পাগল হয়ে গেছি! আমার নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা কর। মানুষের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই রকম নির্ব্বোধ শত শত ক্রিস্‌তফ্‌ তোমার ছোট একটি আঙুলেরও সমান নয়। তোমার সরল স্বভাব তোমাকে ধনী করে রেখেছে। তোমার ফুলটি চুম্বন করে আমি চোখের জল থামাতে পারছি না। আমার অন্তরে এর স্থান। আঘাতে আঘাতে বুকটাকে ভেঙ্গে ফেলে একে সেখানে বসাতে এমনি করে আমি রক্ত দিতে চাই তাহলে তুমি যে কি মহৎ এবং আমি যে কি নির্ব্বোধ তা’ আরও গভীর ভাবে অনুভব কর্‌তে পারব! . . .

—ক্রমশঃ

নিবেদন

পূজাবকাশের পর কল্লোলের বন্ধুবর্গকে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

নোবেল প্রাইজ

বিখ্যাত ডিনামাইট্ আবিষ্কারক বিজ্ঞানবিদ্ অ্যাল্‌ফ্রেড্ নোবেল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মারা যান্। তিনি মৃত্যুকালে ২,৬২,৫০,০,০০৲ টাকা ট্রাষ্টিদের হাতে রাখিয়া যান্ এবং ঐ টাকা সম্বন্ধে উইল্ করিয়া যান্ যে, এই টাকার আয় হইতে বৎসরে পাঁচটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। (১) জড় বিজ্ঞান (২) রসায়ন (৩) ঔষধি বিজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞান (৪) সাহিত্য (৫) শান্তি রক্ষা—এই পাঁচটি বিষয়ের যে কোনওটির মধ্য দিয়া যে-কেহ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহাকেই সে বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই পুরস্কারের মূল্য ১,১৮,০০০ ক্রোনার অর্থাৎ প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা।

মিষ্টার বার্ণার্ডশ'

ষ্টফহল্‌মের ১১ই নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, সাহিত্যের জন্য মিঃ বার্ণার্ড শ'-কে এবারে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে।

মিষ্টার বার্ণার্ড শ' জাতিতে একজন আইরিশম্যান; কিন্তু তিনি তাঁহার বিরাট সাহিত্যের সমস্ত ইংরেজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংরেজ-জাতির ও য়ুরোপের রাজতন্ত্রের অঙ্গে তাঁহার মসী-তরবারী যে গভীর ক্ষত-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, তাহা সহজে ভুলিবার নয়। তিনি Fabian Society-র একজন বিখ্যাত নেতা। শ' নব-নাট্যের ও নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক Ibsen-এর সুযোগ্য শিষ্য। তাঁহার কলম য়ুরোপের সমাজের ও রাজ-নীতির যেখানে যা ত্রুটি ও গলদ্ তাহা অনবরত ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। তাঁহার ভাঙ্গার খেলা দেখিয়া মনে হয় তিনি বুঝি গড়িতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাঙ্গার অবসরে অবসরে Candida-র মত যে অপরূপ রস-মূর্ত্তি সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা আঘাতের ক্ষত-চিহ্নকে ছাড়াইয়া বাঁচিয়া রহিবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী পুরস্কার প্রাপ্তগণের নাম

সাহিত্যের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম এ স্থানে প্রদত্ত হইল।

১৯০৭—রাডিয়ার্ড কিপলিং (ইংলণ্ড) ১৯০৮—আর ইউকেন্ (জার্ম্মানী); ১৯০৯—সেল্‌মা লেগারলফ্ (সুই-

ডেন্); ১৯১০—পি, হেসী (ফরাসী) ১৯১১—জি, মেটারলিঙ্ক (বেলজিয়ম্); ১৯১২—জি, ফটম্যান্ (জার্ম্মেনী); ১৯১৩—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতবর্ষ); ১৯১৪—কাহাকেও দেওয়া হয় নাই; ১৯১৫—রম্যাঁ রলাঁ (ফরাসী); ১৯১৬—ফন্ হিডেনষ্ট্যাম (জার্ম্মেনী); ১৯১৭—কে জিলেবাক্ এবং এইচ্ পণ্টপিডান্; ১৯১৮

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

কাহাকেও দেওয়া হয় নাই; ১৯১৯—সি, স্পিটেলার; ১৯২০—ন্যুট হ্যামসুন্ (নরওয়ে); ১৯২১ আনাতোল ফ্রাঁস্ (ফরাসী); ১৯২২ জে, বেনাভাঁন্তে (স্পেন্); ১৯২৩—ইয়েটস্ (আয়র্ল্যাণ্ড); ১৯২৪ ডবলিউ রেমণ্ট (পোল্যাণ্ড); ১৯২৫ সিগ্‌ফ্রিড উণ্ডসেট্ (সুইডেন); ১৯২৬—বার্ণার্ড শ' (আয়র্ল্যাণ্ড)।

ভারতীয় মহিলার কৃতিত্ব

পুনা শহরের ১লা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, কুমারী গোদাবরী বাই কেলকার ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সংস্কৃতে পি, এইচ্, ডি; উপাধি লাভ করিয়াছেন।

চিত্রশালায় দান

বোম্বাই উইলসন্ কলেজের অধ্যাপক মঈনুদ্দীন আহ্‌মেদ মুসলিম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিত্রশালা নির্ম্মাণ করিবার জন্য ২৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মুসলিম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য মুসলিম্ সম্প্রদায়ের একজন অধ্যাপকের এরূপ চিন্তা ও অর্থ সাহায্য ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের ধনীগণের পক্ষেও দৃষ্টান্তস্থল। দেশের উন্নতির জন্য অপরাপর পন্থা যেরূপ প্রয়োজনীয়, স্বদেশীয় চারুশিল্প ও সাহিত্যের সংরক্ষণ ও গবেষণাও সেইরূপ আবশ্যক।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জেনেভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে ভারতের সম্পাদক সঙ্ঘের নেতারূপে প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউ সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য সম্পাদকের এই গৌরবে সংবাদপত্র-সেবীদেরই গৌরব। তাঁহার য়ুরোপ ভ্রমণের বহু কথা উক্ত-পত্রিকাদ্বয়ে তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি আগামী ২৮এ নবেম্বর নাগাদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রসেবীগণের মধ্যে ইঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার বিশেষ সৌভাগ্য যে, পণ্ডিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী সন্তান।

রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশ যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও রবীন্দ্র-নাথ উভয়েরই এ যাত্রায় রুষদেশ পর্য্যটন করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কারণবশত নাকি তাহা স্থগিদ রাখিতে হইয়াছে।

ভ্রম স্বীকার

কার্ত্তিক সংখ্যার কল্লোলে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু রচিত 'শাপভ্রষ্ট' নামক কবিতায় কিছু ভুল ছাপা হইয়াছে। এই কারণে হয় ত কবিতাটির সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষতি হইয়াছে। আমরা ভ্রম-সংশোধন করিয়া জানাইতেছি যে, ৩৭২ পৃঃ ৭ম লাইন ("আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা") এর পর ৩৭০ পৃঃ ৮ম লাইন্ ("তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্ম্মর") হইতে ৩৭১ পৃঃ ৭ম লাইন্ ("যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়-গুঞ্জন") পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে। ৩৭০ পৃঃ ৭ম লাইনের ("গোপন" জলধি গর্ভে) এর পর ৩৭১ পৃঃ ৮ম লাইন ("অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে") হইতে পড়িতে হইবে।

অগ্রহায়ণের কল্লোলে "অগ্নি" কবিতা রচয়িতার নাম শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায় হইবে।

৪৫৩ পৃঃ "মৃত্যু-দূত" কবিতার ২৮ লাইনের পর 'হাতে-নিয়ে-আসা তার রক্তপদ্ম ম্লান হ'য়ে আছে পদতলে' লাইনটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

রচনা প্রতিযোগিতা

"বর্ত্তমান্ বাঙ্গালার সাহিত্য ও জীবন" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য "ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় রৌপ্য-স্মৃতি-পদক" প্রদত্ত হইবে। কেবলমাত্র কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। "মাতৃভক্তি" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য "তিনকড়ি রৌপ্য-স্মৃতিপদক" প্রদত্ত হইবে। এই পদকের মধ্যভাগ স্বর্ণখচিত হইবে। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। প্রবন্ধ দুইটি বাঙ্গলায়, এক পৃষ্ঠায় এবং স্পষ্টাক্ষরে লেখা বাঞ্ছনীয়। লেখক লেখিকার নাম ধাম, স্কুল কলেজের পরিচয় প্রভৃতি দিতে হইবে। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধ দুইটি :—অবৈতনিক সম্পাদক, কুমার লাইব্রেরী, ৭ নং যদুনাথ সেন লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

হারীন্দ্রনাথ

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তরুণ কবি। বিক্রমপুর নিবাসী ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার ভ্রাতা। ইনি ইংরাজীতেই কবিতাদি রচনা করিয়া থাকেন। জন্মাবধি পিতার সহিত হায়দ্রাবাদে নিবাস করিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। তবুও তাঁহাকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। ইঁহার বহু কবিতা ও নাটকাদি জনসাধারণে সমাদর-লাভ করিয়াছে।
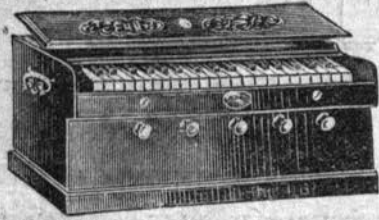
কল্লোল

পৌষ, ১৩৩৩

আদিযুগ আন ফিরাইয়া

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

পুরাতন পৃথিবীর ঘন ঘোর তমিস্রার দিনে
অজ্ঞানের যুগে
তোমার সভ্যতালোক হে ভারত, হে পুণ্য ভারত,
এসেছিল আগে ;
হিমাদ্রির হেমপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মহিমা-ভাণ্ডারে
স্বর্ণ-সিংহাসনে
জন্ম যারে দিয়াছ জননী সেই তব জীবনের
বাণী বহে আনে।
কত দ্রষ্টা কত ঋষি কত বেদ কত সাম-গান
কত জ্ঞান-স্রোত
তোমার হৃদয়-গেহ অন্তঃস্তল হ'তে উৎসারিত
সৃজিয়াছে পথ ;
অজ্ঞানের মরণের বিনাশের সহস্র বন্ধন
টুটিয়া টুটিয়া
ঝরঝর ঝরেছিল ধরণীর দুয়ারে দুয়ারে
ছুটিয়া ছুটিয়া।

মান’ নাই জাতি-ভেদ, কর নাই বর্ণের বিচার
হে মোর দেবতা,
পরিপূর্ণ হস্তে তব বর্ষিয়াছ অকুণ্ঠিত দানে
মঙ্গল-বারতা !
যুগ হ’তে যুগান্তরে ভ্রমিয়াছে তোমার প্রদীপ
দেশ-দেশান্তরে,
উদ্দীপ্ত জ্বলন্ত করি’ জ্বালিয়াছে প্রখর পিপাসা
অন্তরে অন্তরে।
সাঙ্গ করি শত শত শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া
চলে কাল গতি,
তারি আবর্ত্তনে আজি হিংসা-দ্বেষ ক্রূর জটিলতা
করে মাতামাতি।
হে মোর ভারতলক্ষ্মি,আদি যুগ আন ফিরাইয়া ;—
সত্যের আলোক
ঝরুক্ দিবস-নিশি পরিণত করিয়া দ্যুলোকে
মোদের ভূলোক।

মা-হারা

শ্রীনিরুপমা দেবী

আসাম-ঘেঁসা পূর্ব্ববঙ্গের একটি ছোট ষ্টেশন। ডাউন্ ট্রেন আসিতেই কয়েকটি যাত্রী উঠিল এবং নামিল। স্থানীয় যাত্রীরা নিজ নিজ স্থানাভিমুখে পোঁটলাপুঁটুলি লইয়া তখনই রওনা হইল। কিন্তু যাহারা তাহা নয় তাহাদেরই মুস্কিল। বিরস বদনে তাহারা দুর্গন্ধময় ওয়েটিং রুম্ নামক অন্ধকূপের দিকে অগ্রসর হইল এবং আপ্ ট্রেন কখন্ আসিবে তাহার সন্ধান লইয়া তাহাদের মুখ আরও রসহীন হইয়া গেল। সুখের বিষয়, এ রকম যাত্রী আর বেশী ছিল না, মাত্র আমরাই দুটি প্রাণী। সঙ্গে একটি আত্মীয়-সম্পর্কে ছোট দেওর, তাহাকে গো-শকটের সন্ধানে পাঠাইয়া সেই বিশ্রাম কক্ষের প্রায়সম্মুখেই বসিয়া পড়িলাম। ঘরটির সাম্‌নের জমিতে গুটিকত ফুলের গাছ পথিকের যথাসাধ্য চিত্তবিনোদনের জন্য কয়েকটি ফুল ফুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদেরই দিকে চিত্তকে কথঞ্চিৎ নিযুক্ত করিয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেই অন্য একটি বস্তু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া মনকে সেইদিকে ফিরাইল। বস্তুটি একটি মানবক মাত্র! বছর পাঁচ ছ'য়ের একটি কালো কোলো গোল্‌গাল্ হৃষ্টপুষ্ট সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছেলে আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

সচরাচর এমন মিষ্ট স্বর যেন শোনা যায় না। কথার ভঙ্গীটিও পূর্ণ মাত্রায় দক্ষিণ দেশের। এ সব দেশে অন্য দেশের লোকেরা আসিয়া বাস করিলে তাহাদের কণ্ঠস্বরেও এ দেশের একটু ধরণ আসিয়া যায়; তাই এইখানে এবং এ রকম বেশের ছেলের মুখে এই সুরের ও বেশ একটু ভদ্র ধরণের কথায় একটু কৌতূহল আনিয়া দিল। বলিলাম, এই তোমাদের দেশেই যাব খোকা!

আমাদের দেশে?—আপনি আমাদের দেশে যাবেন? তবে আপনি এখানে নামলেন কেন?

এখানে কি তোমাদের দেশ নয়?

না তো। দেশে আমার দিদি-মা আছেন, তাঁর কাছে আমার খুকু বোন্‌টি আছে, আপনি সেইখানে যাবেন?

না খোকা, এইখানে একটি গ্রাম আছে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে, আমি সেইখানে যাব।

কেন?

হাসিয়া বলিলাম, নিমন্ত্রণ আছে।

নেমন্তন্ন? তবে যাচ্ছেন না কেন?

যেমন পাখীর মত কথাগুলি, তেমনি অনুসন্ধিৎসু মিশুনে ধরণ! ছেলেটির সঙ্গে কথা কহিতে বেশ ভালই লাগিতেছিল। বলিলাম, সম্মুখের এই আপ্ ট্রেনে আমার এক জা তাঁর ছেলে-মেয়ে নিয়ে আস্‌বেন, তাঁদের নিয়ে তবে যাব।

এই জয়ন্তী যাবার গাড়ীতে? সেটা আস্‌তে আর কত দেরী আছে দাঁড়ান্ আমি জেনে এসে বল্‌ছি।

বারণ করিবার সময় না দিয়া বালক নিমিষে উধাও হইল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এখনো ঘণ্টাখানেক দেরী আছে, জানেন?

জানি। তোমার নাম কি খোকা?

আমার নাম কালো। আমার সেই বোন্‌টি তার নাম খুকু, বাবা বলেন।

কেমন একটা সন্দেহ আসিতেছিল, পরিচয়কে অগ্রসর করিতে মনে যেন আঘাত লাগিতেছিল, বলিলাম, তোমার বোন্ তোমাদের কাছে থাকে না?

না, এখানে কে তাকে দেখ্‌বে? বাবা দিনরাত ইষ্টিশেনে থাকেন আর আমিও থাকি, ঘরে তালা দেওয়া থাকে। আবার এখান থেকে বদলীর হুকুম হ'লেই চলে যাব। বোন্‌টি যখন বড় হবে তখন আমাদের কাছে আসবে

সে এখন কত বড়?

কি জানি, বাবা বলেন তিন চার বছরের হয়েছে।

তোমার কি তাকে মনে পড়ে না?

খুব ছোট্টটিতে দেখেছি আমি তাকে!

তোমার বাবা এখানে কি করেন?

তিনি ইষ্টিশেন্ মাষ্টার।

তোমাদের রান্না-বান্না কে করে?

বাবাই করেন! ট্রেন পাশ্ করে দিয়ে তিনি বাড়ী গিয়ে রাঁধেন। ঐ আমাদের বাড়ী।

তারপরেই বালকসুলভ চপলতায় বলিয়া উঠিল, যাবেন আমাদের বাড়ী? বাবার কাছ থেকে তাহ'লে চাবি নিয়ে আসি?

না খোকা, আমাদের এখনই যেতে হবে।

এখনো তো আপ্ আস্‌তে দেরী আছে, চলুন না একবার!

না খোকা, আমার দেওর রাগ করবে।

মুহূর্ত্তে বালকের হাসিমুখখানি মলিন হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল, আমার মা নেই কিনা, তাই আমাদের বাড়ী কেউ যায় না। ছোটবাবুর বাসাতে গাঁয়ের মেয়েরা এক একদিন বেড়াতে আসে। আমাদের বাসায় আসে না। আপনিও তাই কি করে যাবেন।

এতটুকু বালকের মুখের এই কথাগুলি বুকে যেন কাঁটার মতই বিঁধিল। বলিলাম, না খোকা, আমার দেওর যে এসে খুঁজবেন। তিনি গরুর গাড়ীর সন্ধানে গিয়েছেন, এখনি আস্‌বেন।

গরুর গাড়ী এখানে তো পাওয়া যাবে না। যে গাড়ী আছে সে মাল্-বওয়া গাড়ী, তাতে ছাপোর নেই তো, কি করে আপনি যাবেন?

আমাদের গাড়ী আসবার কথা আছে।

বলিতে বলিতেই দেওর আসিয়া সুসংবাদ দিলেন, মুস্কিল হল বৌদিদি, ছোটদাদা গাড়ী তো পাঠান্ নি।

উপায়? আর আপ্ ট্রেনও তো এসে পড়্‌ল ব'লে।

হাঁা। সে রাস্তা ভারি বিশ্রী, নদীর ধারে ধারে ভাঙনের ওপর দিয়েই প্রায়, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি। তাও তো গাড়ী পেলে বাঁচি! এখানে গাড়ী পাওয়াও যে মুস্কিল।

কালো আবার উৎসাহে মুখ উৎফুল্ল করিয়া বলিয়া উঠিল, আমাদের বাসায় থাকুন না, সকালে উঠে যাবেন। বাবা তখন আপনাদের গাড়ী খোঁজ ক'রে দেবেন।

বাঃ বৌদিদির কথা কইবার বেশ লোকটি মিলেছে তো দেখ্‌ছি!

সত্যই তাই! খোকা, আমাদের এই রাত্রেই যেতে হবে। তোমার বাবা যদি গাড়ীর সন্ধান দিতে পারেন তো এ বেলাই সেটা সন্ধান ক'রে যদি তিনি দেন তো খুব উপকার হয়। তুমি এঁর সঙ্গে তোমার বাবার কাছে যাবে কি একবার?

খোকাকে যেতে হবে না, আমিই দেখ্‌ছি গে সে উপায়! আপ ট্রেন আসুক, ওঁদের নামিয়ে নিই, তারপরে যা হয় করতেই হবে।

কিছু সন্দেশ যদি পাওয়া যায় ঠাকুর-পো দেখ না?

ভাল বলেছেন বৌদিদি! এখানে এক চিপিটকই একম্ এবং অদ্বিতীয়ং। আর পেতে পারেন চিটেগুড়ের মুড়কী!

দেওর চলিয়া গেলে আবার সেই বালকের সুখ দুঃখের কাহিনীতে মন নিমগ্ন হইয়া পড়িল। এক পিতৃহীন পিতৃ-হীনার একটু সুব্যবস্থার জন্যই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ, পথের মাঝে এক মাতৃহীন আসিয়া কোথা হইতে তাহার করুণ কাহিনীতে অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। গরীব ষ্টেশন মাষ্টার বিপত্নীক অবস্থায় এই ছেলেটি মাত্র সঙ্গে

লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। মা ভগ্নী কেহ নাই, আছেন এক শাশুড়ী, তাঁরও সংসার আছে, মা-হারা নাতনীটি তাঁর কাছে আছে। বলিলাম, কালো, তুমিও কেন দিদি-মা'র কাছে থাক না?

বাবার যে কষ্ট হবে একা থাক্‌তে!

আর তোমার এই রকম থাক্‌তে কষ্ট হয় না?

হয় বৈকি! আমায় ইষ্টিশেনের সবাই খুব ভালবাসে। রেল থেকে যারা নামে উঠে দেখি, তাদের সঙ্গে গল্প করি আর রাত্রে রামদীন্ পাঁড়ের সতরঞ্চিতে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রের ট্রেন বেরিয়ে গেলে বাবা যখন বাসায় যান্ সে আমায় দিয়ে আসে। এখনও যখন খুসি বাবার কাছে যাই।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মাকে মনে পড়ে না?

একটু একটু মনে পড়ে। লাল পাড়ের কাপড় পরা আর সিঁদূর মাথায় ছিল। মা আল্‌তা পর্‌তো। জানেন, একদিন রেলের একটা ক্যাবিনে আমি ঠিক্ মা'র মত লাল কাপড় পরা একজনকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে এ ইষ্টি-শানে নয়,—আমরা তখন দীনহাটায় ছিলাম, তাঁকে দেখে মনে হ'ল যে মা! আমি মা ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়েছিলাম, তারা আমায় নামিয়ে দিলে। ভগ্‌লু দেখ্‌তে পেয়ে আমায় টেনে নিয়ে এল। এত বল্লাম, মা'র সঙ্গে যাব, তা আমায় যেতে দিলে না! এখানে এত গাড়ী যায় কিন্তু আর মাকে দেখ্‌তে পাই নে। বাবা যদি আবার দীনহাটায় বদ্‌লি হয় তো বেশ হয়, তাঁকে রেলে দেখ্‌তে পাই।—আপনি কাঁদছেন কেন? আমার মা'র জন্যে বুঝি আপনারও কষ্ট হচ্চে?

খোকা, তোমার মা স্বর্গে গিয়েছেন! সেখান থেকে তিনি তোমায় দেখ্‌তে পান্—আদর করেন, আশীর্ব্বাদ করেন! তুমি—

আমি যে দেখ্‌তে পাই না! মা কেন রেলে ক'রে আসে না একবারও! কত লোক যে আসে যায়। রেলে তো সেই মা'র মত সেও যাচ্ছিল। মা কেন যায় না? আমি তা হ'লে তো দেখ্‌তে পাই আর এক ছুটে গিয়ে রেলে উঠে পড়ি, ভগ্‌লু কিছুতেই আমায় আন্‌তে পারে না!

খোকা, তাহ'লে যে তোমার বাবা একা থাক্‌বেন আর কাঁদবেন!

বালক একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বাবাও তাই বলেন। কিন্তু মা একবার এলেও তো পারেন, তারপরে আমি বাবার কাছেই থাকি!

হায়, বালকের এই একবার দেখার পিপাসাই কে মিটাইবে! হায় ভগবান্, কি তোমার বিধান! ঐটুকু বুকে জগতের সব চেয়ে বড় ব্যথাই এমন করিয়া পুরিয়া দিয়াছ! এই বিয়োগ বিধুরকে সান্ত্বনা দিবার জগতে কিছু আছে কি?

কথা ফিরাইবার জন্য বলিলাম, খোকা, তুমি কখন খেয়েছ? আমার কাছে ভাল আম আছে, খাবে? তোমাদের এখানে সন্দেশ পাওয়া যায় না?

আমি ফলার খেয়েছি, রাত্রে বাবা ভাত রাঁধবেন, আমায় তখন তুলিয়ে খাওয়াবেন।

তা হোক, তুমি দুটি আম খাও। আমি পরশু তরশু আবার এইখানে ফিরে আসব, তোমার জন্যে তখন সন্দেশ আন্‌ব।

আপনি আবার বুঝি আসবেন? কবে? কোন্ সময়ে?

পরশু আস্‌ব খোকা, যে ট্রেনটায় এলাম ঐটা যাবার আগে।

আপনাকে আমি কি বলে ডাক্‌ব বলুন না। কি বল্‌ব?

হায় মাতৃহারা! দু'দণ্ডের পথিকের সঙ্গে তুই কি সম্বন্ধ পাতাইতে চাস্! বলিলাম, মাসি-মা বল্‌বে।

বালক যেন ঈষৎ অনিচ্ছুক ভাবে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ! তার পরে একটু থামিয়া যেন একটু ভয়ের সঙ্গেই বলিল, আমার মা বলে ডাক্‌তে বড় ভাল লাগে! কাছে যখন কেউ থাকে না, চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকি—মা, ওমা!

হায় রে বালক! কাকে মা বলিয়া তোর এ ব্যথা জুড়াইবে? এ তো জুড়াইবার নয়! বলিলাম, তোমার বাবা

তোমায় একটি লাল কাপড়-পরা মা এনে দেন না কেন খোকা? তুমি বাবাকে বল'।

বালক অবাক্ ভাবে খানিকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া শেষে ব্যস্তভাবে বলিল, এখনি ব'লে আস্‌ব?

না, এখন নয়, রাত্রে বল'।

আচ্ছা!

ঘরের সম্মুখ দিয়া একজন জমাদার গোছের লোক চলিয়া যাইতে যাইতে একবার হাঁকিল, কালো বাবু কি হচ্চে?

আম খাচ্চ রাম্‌দীন!

আচ্ছা খাও! মগ্‌র্ টেইন্ আস্‌ছে, ঘরের দুয়ার থেকে দেখিও, আচ্ছা?

আচ্ছা।

জমাদার নির্দ্দিষ্ট কাজে চলিয়া গেল। বালকটি ষ্টেশনের সকলেরই স্নেহের ধন বোঝা গেল—হায় তবু এর সিন্ধুর পিপাসা এক বিন্দুতে মেটে কই?

হুস্ হুস্ করিয়া আপ্ ট্রেণ্ আসিয়া গেল। বালক ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যাত্রীদের দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বুকের সেই উৎকণ্ঠা-উদ্বেলিত স্পন্দন নির্নিমেষ চক্ষুতে দেখিলাম, সে সেই 'মা'র মত কে' বা মাকেই এমনি করিয়া প্রতি ট্রেনে খুঁজিতেছে। ট্রেন চলিয়া গেল, জা ছেলে-মেয়ে লইয়া নিকটে আসিলেন। তাঁহারও মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বালক ক্ষুদ্র একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আবার গল্পে মন দিল। গল্পের আর বড় সময় ছিল না। দেওর অতি কষ্টে ষ্টেশন মাষ্টারেরই সহায়তায় একখানি মালবাহী গো-শকটে কাহার বাড়ী হইতে একটি ছই চাহিয়া লইয়া একখানি 'যান' খাড়া করিয়া আমাদের তাহারই মধ্যে "লাদাই' করিলেন। বালক শকটের পিছনে পিছনে খানিকটা আসিল, পরশু আসবেন তো মাসি-মা? বৈকাল বেলায় তো? নিশ্চয় আসবেন, বলিতে বলিতে আসিল।

শেষে রামদীন বা ভগলু কাহার ডাকাডাকিতে অগত্যা ম্লান মুখে নিকটস্থ একটি গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিল। সঙ্গী সকলে একটু অবাক হইতেছিলেন, শেষে সব শুনিয়া সকলেরই চোখে জল আসিল।

সেইখানে অন্ধকার রাত্রে নদীর ধারে ধারে উঁচু নীচু ভাঙন ও পাড়ে উঠিয়া পড়িয়া সে যাত্রার অকথ্য কাহিনীতে আর কাজ নাই! ফেরার দিনের কথাই বলা যাক। পরশুর স্থানে তরশু হইয়া গেল—এবং সেই বালকটির সঙ্গের জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টায় শীঘ্র বাহির হইলেও ষ্টেশনে পৌঁছিতে ট্রেন আসার বেশী দেরী রহিল না। পৌঁছিতেই কালো 'কাল কই এলেন না মাসি-মা? কেন এলেন না?'—বলিয়া শকট হইতে আমায় টানিয়াই প্রায় নামাইল।

তারা ছেড়ে দেয় নি কালো। ইত্যাদি বলিতে বলিতে তার হাতে খাবার দিলাম, সে দিকে সে তত আগ্রহ না করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আজ আমাদের বাড়ী যাবেন তো মাসি-মা? আজ আপনাকে যেতেই হবে। সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না!

দেওরের মুখের পানে চাহিতে সে বলিল, আর আধঘণ্টাও সময় নেই।

তাহোক তুমি চল একবার।

ঐ যে আমাদের বাসা দেখা যাচ্চে। ঐ ইঁদারার ধারে বাবার কাছে চাবী চেয়ে আনি, দাঁড়ান।

চাবি আর এনো না খোকা, এখনি আমাদের ট্রেন এসে পড়বে! আমাকে একটু জল খেতে হবে ঠাকুর-পো, ইঁদারা পর্য্যন্ত যেতেই হবে যে!

তাহলে চলুন শীগ্‌গির, বেশী সময় নেই! বাক্সটা এদের জিম্মা ক'রে ঘটি নিয়ে যাচ্চি, আপনি এগুন খোকার সঙ্গে।

বালক আমার সঙ্গে চলিল বটে কিন্তু তাহার উৎসাহ যেন মুহূর্ত্তে নিবিয়া গিয়াছে। একবার মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনিও কি এই ট্রেনে চলে যাবেন?

উত্তর দিতে কষ্ট হইতেছিল, কেবল বলিলাম, আবার কিছুদিন পরে এই দিকে আস্‌ব কালো! আমার সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন উনি দুদিন পরে আবার ফিরে আসবেন,

তোমার জন্তে ওঁর হাতে খেলনা পাঠিয়ে দেব, বল্ পাঠিয়ে দেব, সন্দেশ দেব!

কালো সে কথা কানেই তুলিল না, বলিল, ওঁর সঙ্গে আপনি আসবেন না?

আমি অনেক দিন পরে আসব!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বালক যেন নিজের মনেই বলিল, বাবা তখন আর কোথাও বদলী হয়ে যাবেন হয় ত।

এইটুকু বালক ফাঁকি দিবার একটুও উপায় নাই! প্রকৃতিই ইহাকে বিজ্ঞ করিয়াছে। এই নিত্য বহুবারের আনাগোনার পথে বসিয়া জগতের পথিকদের সে ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। আরও জানিয়াছে যে, দৈবাৎ একবার যাহার সঙ্গে দেখা হয়, জীবনে আর তাহার সহিত দেখা নাও হইতে পারে। মাসি-মা বলিয়া ডাকিয়া মা-হারা-শিশু ভাবিয়াছিল, এ বুঝি তাহার আপনারই কেহ হইবে, কিন্তু পলকে বুঝিয়া লইল যে, না এও পান্থ! একটু কেবল পথের পথিকেরই স্নেহ, তার বেশী কিছু না!

ইঁদারার ধারে জল খাওয়ার ছলে তাদের বাড়ীর জানালা দিয়া ঘরের ভিতরের আভাস মাত্র দেখা এবং তার পরে প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই ট্রেন ধরা ইত্যাদির কথা আর বেশী কিছু বলিবার নাই, কেবল মনে করিবার আছে সেই মাতৃহারার নির্ব্বাক চাহনি! বাকপটু শুক শিশু মুহূর্ত্তে মূক হইয়া গিয়া শেষ কয় মুহূর্ত্ত কি ভাবে স্তব্ধ হইয়াছিল। তাহার মুখ দেখিয়া আর সান্ত্বনার মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না। ট্রেন ছাড়িয়া দিল, নিশ্চল চক্ষে কালো শুধু উদাসভাবে চাহিয়া আছে দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে সে, সে-ষ্টেশান সব অদৃশ্য হইয়া গেল! সেই সায়াহ্ন আকাশ তলে সেই উলঙ্গ কালো ছেলেটির মত বিশ্বই যেন বিয়োগ বিধুর ম্লান মুখে বেদনা ভরা নিশ্চল চক্ষে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সারা পথ এমনি মনে হইতেছিল। তাহার বুকে শুধু জমাট কালো রংয়ের ব্যথাই পুঞ্জীভূত! জলেস্থলে অন্তরীক্ষে শুধু বেদনারই অব্যক্ত স্পন্দন!

* * * *

দেওর ফিরিয়া গিয়া পত্রে একটু মাত্র লিখিয়াছিলেন—

বৌ-দিদি, আপনার জিনিষগুলি নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়েছিলাম। আপনার কালোকেও দেখতে পাই না ট্রেনও ছাড়ে, শেষে হাঁকাহাঁকি করে মাষ্টারের দেখা পেয়ে কোন রকমে তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছি। ভদ্রলোককে ভালো করে বলার অবকাশও হল না, কালোকে দেবেন, তার মাসি-মা দিয়েছেন—এইটুকু যদি তাঁর কানে গিয়ে থাকে। ছেলেটিকে না দেখতে পেয়ে মনটা সত্যি আমারও খারাপ হ'য়েছে। দেখ্‌ব আবার যখন যাব ও-পথে, যদি খোঁজ পাই।

কিন্তু খোঁজ আর পাওয়া যায় নাই কিম্বা তাহারই হয় ত সে কথা আর মনেই ছিল না। আমার আর সে পথে যাওয়াও হয় নাই, সে কোথায় আছে আর কখনো জানার উপায়ও হয় ত হইবে না।

এই যাত্রা-পথের কাহিনী সবই প্রায় এই ধরণেরই।
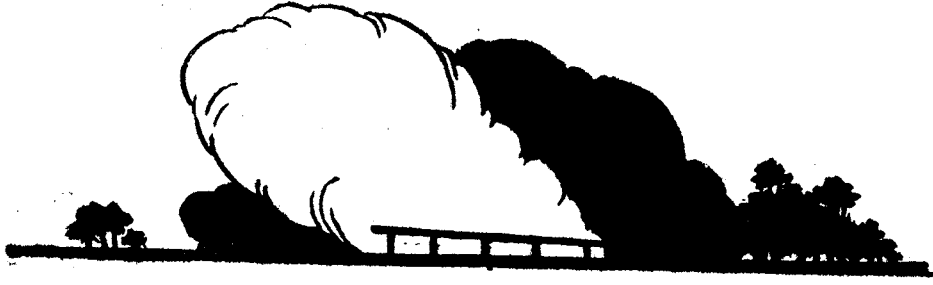
সর্ব্বনাশের সুখ

গোকুলচন্দ্র নাগ

১০ই বৈশাখ
চিত্রা, ওয়ালটেয়ার

ভাই জ্যোতি,

তুমি হয় ত আমার এই বিষয়টীকে খুব ভাল ভাবে নিতে পার নি। এবারকার চিঠিতে আমায় অনেক শুভ ইচ্ছা কামনা পাঠিয়েছ, কিন্তু তোমার মনের কোণে একটী দুর্জ্জয় অভিমান, চাপা আগুনের মত যে লুকান আছে, সেটী আমার কাছে ঠিক ঢাকৃতে পার নি। খুব সম্ভবত এটীকে তুমি আমার অধঃপতনের চূড়ান্ত সাব্যস্ত করে নিয়েছ, নয় কি? আমার জীবনে এই রকমের একটী পরিবর্ত্তন (বা সকলের মত বিপর্য্যয়) হ'তে পারে, তা হয় ত তোমার স্বপ্নের বাইরে ছিল।

কাল আমি একটী বেনামী চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানি যিনি লিখেছেন, তিনি লেখক নন,—লেখিকা। আর তাঁর নাম স্বাক্ষর না করা সত্বেও বুঝ্‌তে পেরেছি, তিনি কমলা রায়। সে অনেক দুঃখ প্রকাশ করবার পর লিখেছে—তুমি আজ এই যে ছেলেমানুষী করলে, এর জন্যে চির-জীবন তোমায় ভুগ্‌তে হবে। আমি তাকে উত্তর দিয়েছি,—কমল, তুমি হয় ত আমাকে অভিশাপ দিয়েছ, কিন্তু আমার কাছে আজ সেটা আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে হচ্ছে। তাই আমিও তোমায় আশীর্ব্বাদ না ক'রে থাকৃতে পারলাম না। তোমাকে যেন আমারই মত চিরজীবন ভুগ্‌তে হয়। এর চেয়ে কামনার ধন আর আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

আমরা তিন জনে যেদিন হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করি—এ জীবনে কখনও কোন পুরুষের কাছে আত্মবিক্রয় করব না, আমাদের নারীত্বের অমর্য্যাদা কখনও হতে দেব না, সেদিন আমি সেই প্রতিজ্ঞাটীকে খুব সম্মানের সঙ্গেই মনে ঠাঁই দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ত আমার আগুনকে আমি দেখি নি। জ্যোতি, সে কি আগুন? আমার যে আর কিছুই বাকি রইল না! আমার যা-কিছু সমস্তই আহুতি দিয়েছি, তবুও যে আশা মিট্‌ছে না। আমার সমস্ত বুকখানিকে নিংড়ে দিলে কি শান্তি পাব? আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার জীবনের এই একুশ বছর একেবারে বৃথা হ'য়ে গেছে! শুধু বৃথা ব'লে আমার

মনের ভাবটা ঠিক ক'রে যেন প্রকাশ করতে পারছি না। এর চেয়ে বেশী ক'রে প্রকাশ করবার আর কোন কথা জান কি?

সেই কথাটা কি তোমার মনে আছে?—প্রতিজ্ঞা করবার পর, আমরা তিন জনে সন্ধ্যা বেলা চুপ ক'রে বসেছিলাম। তোমরা কি ভাবছিলে জানি না, আমার বুকের ভিতর কান্না গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল। কোন প্রকারেই মনটাকে হাল্কা করতে পারছিলাম না। অন্যমনস্ক হবার জন্যে সেতারটা নিয়ে বসলাম, কোন সুরই মনে এল না। কমলা রেগে বল্‌ল—তোর হ'ল কি? তারপর সে গান ধরল।

বেয়ারা ঘরে আলো রেখে গেল। আমি জানালার কাছে সরে গিয়ে বসলাম। যতদিন প্রতিজ্ঞা করি নি তত দিন চিরকুমারী থাকার ভিতর একটা খুব বড় রকমের কবিত্ব দেখ্‌তে পেতাম। প্রতিজ্ঞা করার পর মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, আমার বুকের আধখানা শূন্য হয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে কারো জন্যে ভাবতে হ'বে না। স্নেহ, ভালবাসা আর যা-কিছু মেয়েমানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে মনটাকে ভরে রাখতে হবে না। শুধু আমি, একা আমি! আমায় বরণ করে নেবার জন্যে বিশেষ করে কেউ তার হৃদয়ের প্রীতিচন্দনে সিক্ত করা নির্ম্মাল্যখানি আমার গলায় পরিয়ে দেবে না! জ্যোতি, তখন আমার মনে হচ্ছিল, এ কি করলাম! এমন শূন্য বুকখানা নিয়ে বাঁচব কি ক'রে?

হঠাৎ এক সময় পিছনের দিকে ফিরে দেখি, তুমি একমনে আলোর ওপর থেকে একটা একটা ক'রে পোকা তুলে ফেল্‌ছ। সবগুলির পাখা পুড়ে গেছে। আমি তোমার কাছে এসে বসলাম। একটা পোকা, চিমনি থেকে আমার হাতের ওপর পড়ল। আমি কেঁপে উঠলাম। তোমার চোখ দুটী জলে ভ'রে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন কোন কারণ জিগেস করি নি, কেন জান?—তখন তোমার মনের সঙ্গে আমার মনের মিল হয়ে গিয়েছিল। আজ আমারও সেই পোকাগুলির দশা হ'য়েছে, তবু আগুন আমায় স্পর্শ করেছে, এ সুখের কথাটা যে কিছুতেই ভুল্‌তে পারছি না।

আমি তোমার কাছে কখনও কোন বিষয় লুকাই নি। আমার জীবন-ইতিহাসের এই নূতন অধ্যায়টার গোপন কথাটাও লুকাব না। তুমি যেমন-খুসি আমার বিচার কোরো, ক্ষতি নাই। এখন আমি তোমাদের সব বিচারের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি।

ওয়াল্‌টেয়ারে এসে মা আর টুনুকে নিয়ে যে বাড়ীতে উঠলাম, সেটা একেবারে সমুদ্রের ধারে। স্বর্গ কি এর মত সুন্দর? আমি ত এমন জায়গা ছেড়ে সেখানে যেতে চাই না। মা আর টুনুকে নিয়ে রোজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। মা চুপ করে বালির উপরে ব'সে থাকেন, আমরা দুই বোনে খুব লুটোপটি করি। ঝিনুক কুড়াই। ঢেউ সরে গেলে সমুদ্রের ভিতর নেমে যাই, আবার ঢেউ আসবার পূর্ব্বে ছুটে ওপরে উঠে আসি। এক একদিন ঢেউ লেগে সব ভিজে যেত। এই রকম ক'রে একমাস কি আনন্দে যে কেটে গেল তা তোমায় বোঝাতে পারব না। তার পর একদিন কি করে যে সব ওলট্‌পালট্ হয়ে গেল কিছুই ঠিক পেলাম না।

তখন ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। চারিদিকে কিসের একটা আভাষ ফুটে উঠে দেহ-মনে যেন গোলাপী রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল। সে দিন বিকালে আমি একা বেরিয়ে পড়েছিলাম। আসবার সময় আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌ল। আনন্দে কি বেদনায় তা জানি না।

পশ্চিম আকাশে একটু একটু ক'রে রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। পাহাড়গুলির গায়ে সবুজ পাতায় পাতায় তার আভা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। একটা ঝরণা লীলাভরে পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। আমি সেই দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। আমাদের বাড়ীর পরের দুটী বাংলা পার হয়েই দেখি একটা বাগান। তার ভিতরে আবার ছোট একটী বাগান, ফুলে ফুলে বাগানখানা ভরে গিয়েছে। মাধবী হাজার ডাল পাতা ফুল দিয়ে যেন এটীকে বুকে চেপে ধরেছে। জানালাগুলির চারিধার অপরাজিতার নিবিড় নীলরূপে ভরা, দেখে আর চোখ ফেরাতে পারা যায় না। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে ভাবছি, যদি কোন মেয়েকে

দেখতে পাই তা হলে বিনা নিমন্ত্রণেও ওর ভিতর একবার যাব।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কুড়ি হাত দূরের মধ্যে ও কি? ভাই জ্যোতি, আমি কেমন করে বলব, সেই মুহূর্ত্তে কি হয়ে গেল আমার। সেই পোকা যেমন ক'রে সেদিন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, সেই রকম ক'রে আমার সমস্ত দেহ-মন যে ঐখানে লুটিয়ে পড়তে চায়, এ কি বেদনা! আমার বুকখানি যদি পাথরেরও হ'ত তাহলেও বুঝি সহ্য কর্‌তে পারত না, ফেটে যেত।

আমি বুঝতেই পারি নি তখন এক-পা এক-পা করে ঠিক তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি! আমার বুকের ভেতর ওঃ সে কি জোরে শব্দ হচ্ছিল। আমার ভয় হ'তে লাগল, হয় ত উনি এখুনি শুন্‌তে পাবেন।

আমাদের দু'জনের মধ্যে শুধু একটী ঝাউ গাছের ব্যবধান। সাম্‌নে অনন্ত নীল সাগরের জল কূলে এসে লুটিয়ে পড়্‌ছে। তার কান্নার সুর সমস্ত বেলাভূমিটীকে ব্যথিত ক'রে তুলেছিল।

তিনি একটা পাথরের ওপর হেলান দিয়ে সাম্‌নে ইজেলের ওপর টাঙ্গান একখানা প্রকাণ্ড ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলি বালির ওপর চারিদিকে ছড়ান ছিল। তোমরা যখন আমার আঁকা ছবির প্রশংসা করতে, গর্ব্বে তখন মন ভ'রে যেত। আজ যা দেখলাম, এর যে তুলনা নাই! কি সুন্দর সে ছবি জ্যোতি, কি সুন্দর!

একটী মেয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, ঢেউগুলি তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। তার নিবিড় কালো চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। আঁচলের খানিকটা বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। সে একহাত দিয়ে তাই বুকের ওপর চেপে ধ'রে, আর এক হাত দিয়ে মাথাটীকে একটু হেলিয়ে চুলগুলিকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। তার সুন্দর মুখখানির ওপর বিরক্তির সঙ্গে একটী কেমন আনন্দের আভাষ ফুটে উঠে সমস্ত বিষয়টীকে কি মধুর করে তুলেছে! পাগল হাওয়া এই মেয়েটীর চুল কাপড় টেনে যেন তাকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করছে। প্রকৃতির ছেলেমানুষী, মেয়েটীর ত্রস্তভাব, ছবিখানিতে কি আশ্চর্য্য রকম ফুটে উঠেছে!

আমার বিস্ময়ের আবেগ একটু কম্‌লে বললাম, কি সুন্দর! তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে তীব্র আনন্দের বন্যা ছুটে গেল। আমি নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিতে গেলাম। কিন্তু আমার হাত তাঁর পা স্পর্শ করল না, তিনি স'রে গেলেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানকার ধূলা মাথায় নিলাম।

আমি আজ নিজের মুখে যে লজ্জাহীনতার কথা স্বীকার করলাম এর জন্যে হয় ত তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ? বাঙালীর মেয়ে এমন করে কখনও পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে তা' হয় ত তুমি ভাবতেই পার না। কিন্তু আমি পেরেছি, এই কথাটা বল্‌তে গর্ব্বে আমার বুক ভ'রে উঠ্‌ছে। সে যাক, তারপর শোন।

তাঁর শান্ত চোখ দুটীর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর পড়ল। সে আনন্দের আঘাত আমি সহ্য করতে পারলাম না, মাথা নীচু হয়ে গেল। তিনি বিস্মিত হ'য়ে জিগেস করলেন, কে আপনি? আমি তেমনি মাথা নীচু করেই বললাম, আমি নিরুপমা। আমার ভয় হচ্ছিল, আর একবার যদি ঐ সুন্দর চোখ দুটীর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে তা হ'লে পাগল হয়ে যাব।

বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর সমস্ত দেহখানি কেঁপে উঠ্‌ল। তিনি আবার জিগেস করলেন, কে? আমি বললাম, নিরুপমা। এবার আমার কথাটী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে রঙ-এর পাত্রটী পড়ে গেল! আমি মাথা তুলে দেখি তাঁর চোখের পাতা দুটী বুজে গেছে, মুখখানি কাগজের মত সাদা! তাঁর কাছে স'রে আসবার পূর্ব্বেই তাঁর দেহখানি বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

এ কি হ'ল! আমিই কি এই সমস্তের কারণ? কিন্তু আমাকে ত ইনি চেনেন না, কখনও দেখেন নি। সমস্ত সঙ্কোচ দূরে ফেলে তাঁর কপালে হাত রাখলাম, মাথাটী

একটু তুলে ধরলাম, চেতনা নাই! ছুটে বাগানের ভিতর গেলাম কিন্তু কাউকে ত দেখতে পেলাম না! গাছে দেবার জন্যে ঝারিতে জল ছিল, আঁচলখানি ভিজিয়ে নিয়ে এসে তাঁর মাথায় চোখে মুখে মাখিয়ে দিলাম, তিনি চোখ মেল্‌লেন না।

জ্যোতি, ইনি সেই শিল্পী যাঁর নামের পাশে আমার নাম রেখে সকলে কৌতুক করতেন, আর যাঁর ফটো আমার এল্‌বামে দেখে একটু চাপা হাসি তোমার ঠোঁট দু'খানিতেও ফুটে উঠেছিল। তাঁর আঁকা ছবি ভালবাসতাম, কিন্তু তাঁকে যে এত ভালবেসে ফেলেছি তা ত জানতাম না। এমন ক'রে তাঁর দেখা পাব তা' যে স্বপ্নেও ভাবি নি!

আমার ফির্‌তে অত্যন্ত দেরী হ'চ্ছে দেখে বেয়ারাকে নিয়ে টুনু আর মা আমায় খুঁজ্‌তে এসেছিলেন। সমুদ্রের ধারে একজন পুরুষের মাথা কোলে ক'রে বসে আছি দেখে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন। মা এগিয়ে জিগেস করলেন, নিরু, এ কি? আমি বললাম, মা, সে কথা পরে হবে, আগে এঁকে বাড়ী নিয়ে চল।

সেই রাতের পর আরো দুটী রাত কেটে গেল তবুও জ্ঞান তাঁর হ'ল না।

পূর্ব্বে তোমাকে যে একখানা বাগান-বাড়ীর কথা বলেছি, সেটী এঁরই। সেখানে খোঁজ করে জানলাম, তিনি একাই থাক্‌তেন, একজন চাকর ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে থাক্‌ত না। মধু সেদিন সকালে আমার পা দুটী জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, দিদিমণি, তুমি আমার বাবুকে বাঁচিয়ে দাও। চোখের জল আর তার বাধা মানে না। ওঁকে ভাল করে' দেবার জন্যে কেউ আমাকে অনুরোধ করবে? যদি আমার জীবন পাত করার সঙ্গেও তাঁর ভাল হওয়ার কোন সম্পর্ক থাক্‌ত, তাহলে তোমাদের নিরুপমার এতদিনে আর উদ্দেশ পেতে না।

মা'র কাছে কিছুই লুকান চলে না। আমাদের মনের অতি গোপন কথাটীও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারাণ্ডার এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। কি ভাবছিলাম তা জানি না। শুধু মনে পড়ে, সমস্ত দেহ পুড়ে যাচ্ছিল। মা এসে আমার মাথাটী কোলে টেনে নিলেন, তারপর কান্না আর কান্না!

মা বললেন, "নিরু, এখুনি অত ব্যাকুল হস্‌ নি মা। আমার ত মনে হয় না তোর জীবনটা একেবারে এমন ক'রে নষ্ট হয়ে যাবে! কান্নায় তাঁর কথাও বন্ধ হয়ে গেল।

মাকে আর টুনুকে শুতে পাঠিয়ে, মধুকে দরজার কাছে বিছানা কর্‌তে বলে আমি তাঁর কাছে এসে বস্‌লাম। টুনু যাবার সময় ব'লে গেল, দিদি, সুকুমার বাবুর চোখের পাতাদুটী একবার খুলে গিয়েছিল। তিনি বাইরেটা দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

টুনুকে জড়িয়ে চুমা দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে তুললাম। তাকে এত জোরে বুকে চেপে ধরে ছিলাম যে, সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছিল।

গোলাপ জলে ভিজান একখানা রুমালে করে তাঁর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছি। তাঁর কাল কোঁকড়ান চুলে বিলি কেটে তাঁর হাত দুটী চেপে তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করছি। জ্যোতি, সে দিন যখন তাঁর মাথাটী কোলে ক'রে সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম, বিস্ময় ছাড়া আর কোন বিশেষ ভাবনা আমার মনে জাগে নি। আজ ঐ বুকের ওপর মুখ রেখে আমার মরে' যেতে ইচ্ছে করছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ একখানি হাত আমার হাতের ওপর পড়ায় আমি জেগে উঠ্‌লাম।

চোখ মেলে দেখি তিনি একহাতের ওপর ভর দিয়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করছেন। তাঁকে আস্তে আস্তে আবার শুইয়ে দিলাম। তিনি অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাই জ্যোতি, ঐ দুটী চোখের দৃষ্টি তেমনিই আছে, শুধু অবসাদে ভরা। তিনি কথা বলবার চেষ্টা করলেন,পারলেন না। অনেক চেষ্টার পর ভাঙ্গা গলায় বললেন, কি হয়েছে আমার? আমি কোথায়? আমি বল্লাম, আপনার অসুখ হ'য়েছে, বেশী কথা বল্‌বেন না। তিনি আবার জিগেস করলেন, কে আপনি? একবার আমার নাম বলে এই সর্ব্বনাশ করেছি, আর নয়। বল্লাম, আপনি আজ বড় দুর্ব্বল, বেশী ডাক্‌বেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি অবার বললেন, আপনার হাত

কি ঠাণ্ডা? আমার কপালের ওপর একবার রাখুন না। ও ভাই জ্যোতি, এ কি শুনলাম আজ? এ কি তৃপ্তি! আর আমি লিখ্‌তে পারি না।

তোমার নিরুপমা

২৭এ বৈশাখ
চিত্রা, ওয়ালটেয়ার

জ্যোতি, আজ সকালে তোমার চিঠি পেলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার চিঠি পড়ে কমলের মত তুমিও আমায় ত্যাগ করবে। ত্যাগ ত করই নি উল্টে আবার একমাসের মধ্যেই এখানে আসছ লিখেছ! আচ্ছা জ্যোতি, তুই কি চিঠি লিখবার সময় কেঁদেছিলি? অর্দ্ধেকেরও বেশী অক্ষর একেবারে মুছে গেছে! আমার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে তোকে বুকে চেপে ধরি।

আজ আমি তোমাকে যে জিনিষ দেখাব কোন প্রকারেই তা যেন আর কারো হাতে গিয়ে না পড়ে। তোমাকে সাবধান করে দেওয়া বৃথা জানি, তবুও একবার না বলেও পারলাম না। আমি তাঁর ডায়েরী থেকে এটা নকল ক'রে নিয়ে তোমায় পাঠাচ্ছি। তুমি যখন আসবে তখন ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

* * * *

—খুব ছেলেবেলাকার কথা আমার মনে পড়ে না, তবে এইটুকু জানি, ভাল রকম জ্ঞান হওয়ার পর হ'তে আমার ষোল সতের বছর বয়স পর্য্যন্ত বড় সুখের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছিল। সে যেন স্বপ্ন। তখন সব বিষয় তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা হয় নি, যা পেয়েছি তার বেশী দিয়ে ফেলেছি। কোন কিছু সঞ্চয়ের কথা আমার মনে হত না। একটা অশান্তভাব সর্ব্বদা আমার মনকে জাগিয়ে রাখত।

তখন স্কুলে পড়তাম, শিক্ষক বেশ ভালবাসতেন। মা'র ইচ্ছা ছিল আমিও দাদার মত একটা কিছু হ'য়ে উঠি। এই কিছু-একটা হওয়ার চিহ্নও নাকি অনেক গুণী জ্ঞানী আমার হাতের রেখায় খুঁজে বার করেছিলেন। কিন্তু একদিন মা'র অশ্রুজল, দাদার উপদেশ এ সকলের বাধা অতিক্রম ক'রে যখন উদ্দেশ্যহীন হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, প্রবীনগণ মাথা নেড়ে আমাকে বিশেষ কোন একটা ফলের সঙ্গে তুলনা ক'রে ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগলেন, তখন সে দৃশ্য দেখে হাসির পরিবর্ত্তে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ক্রমে বাইরের আলো বাতাসের দৃশ্যে আমার মন ভরে গেল। সৌন্দর্য্যের একটা তীব্ররশ্মি আমার চারিদিকে ঝক্‌ঝকিয়ে উঠল।

একদিন আমি একটা ছবি আঁকছিলাম, সূর্য্য ডুবে গেছে। গোধূলির পিঙ্গল রং-এ গাছের পাতা রঙীন হয়ে উঠেছে। দীঘির জলে তার ছায়াগুলি মৃদু বাতাসের হিল্লোলে ছোট ছোট ঢেউর সঙ্গে নৃত্য করছে। সবুজ মাঠ আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

সেদিন আমার ছবিখানি অপূর্ব্ব হয়েছিল। শুধু একটা কথা আমায় বড় কষ্ট দিচ্ছিল। আমি যা করি তা কি কেবলই ছেলেখেলা, এর কি কোন অর্থ নাই?

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমি বাড়ী ফিরবার জন্যে সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে নিচ্ছি, কে বলে উঠ্‌ল, বাঃ কি সুন্দর!

আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটী বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে একটী তরুণী আমার ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার সারা দেহে যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটে গেল। আমার ছবি ওঁর ভাল লেগেছে! তবে সে অর্থহীন নয়! এ কি শুনলাম?

ভাই জ্যোতি, আমার পূর্ব্বে আরো একটী মেয়ে ছবি দেখে অবাক হ'য়ে আমারই মত ওঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর শোন—

বৃদ্ধ লোকটী আমায় প্রশ্ন করলেন, আপনি আর্টিষ্ট?

আমি কি উত্তর দেবো কোন কথাই আমার মুখে এল না। একতারার একটী ঝঙ্কারের মত কেবলই আমার কানে বেজে উঠ্‌তে লাগল, কি সুন্দর, কি সুন্দর!

চলে যাবার সময় বৃদ্ধ লোকটী আমাকে তাঁর ঠিকানা, দিয়ে বল্‌লেন, যদি আপনার সুবিধা হয় তাহ'লে একবার আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে পারেন নাকি?

আমি আমার সম্মতি জানালাম।

স্তম্ভিত মেঘের বক্ষ ভেদ করে বিজলীর ক্ষণিক আলো সারাটী আকাশ উজ্জল করেই যেমন অনন্তনীলে বিলীন হয়ে যায়, একটী তীব্র আনন্দ সেই রকম আমার সমস্ত বুক-খানিকে আকুল করে দিয়ে গেল।

আমি নিরুপমাকে ছবি আঁকা শিখাবার ভার নিয়েছি। একটী পাতা, একটী ফুল থেকে আরম্ভ ক'রে ঝোপ, গাছ, জল, পাহাড় এত সহজে আর এত সুন্দর করে সে আঁকত যে, দেখে আনন্দে আর বিস্ময়ে আমার মন ভ'রে যেত।

অন্ধকারের ঘন পর্দ্দাখানি সরিয়ে উষা পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে ভেসে উঠে, সবুজ গাছের পাতায় পাতায় তার আভা পড়ে ঝিকি মিকি করতে থাকে, শিল্পীর মন ভরে যায়। গোধূলির গৈরিক আলোকে সারাটী আকাশ রঙীন হয়ে যায়! প্রকৃতি রং-এর নির্ঝরে স্নান করে তার সবুজ বসন-খানি সন্ধ্যা বাতাসে যখন দুলিয়ে দেয়, সবিস্ময়ে নিরুপমা বলে বলে ওঠেন, না, না, আমার ছবি এঁকে দরকার নেই! এমন অপূর্ব্ব রূপ সামান্য পটের ওপর কি করে ধ'রে রাখব? আমি তাঁকে বলি একটা উপায় আছে, সে সাধনা।

আরম্ভ হ'ল সাধনা। স্বপ্ন রাজ্য হ'তে কল্পনা নিত্য নব নব রূপে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগ্‌ল। আমরা ডুবে গেলাম! সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আলোক-স্রোতে আমাদের মন সীমা ছাড়িয়ে ছুটে চলল।

হঠাৎ আমাদের কল্পনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস এক জায়গায় এসে প্রতিহত হ'ল! পথ নাই তাকে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্যাতীত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের ষ্টুডিওতে বসে আছি। সামনে আমার আর নিরুপমার আঁকা কতকগুলি ছবি টাঙ্গান আছে। আমি এক মনে তাই দেখছি, পাশের ঘরে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হচ্ছে শুনতে পেলাম।

এ কি করেছি আমি? নিরুপমার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশা আমার উচিত নয়, এ কথা ত একবারও আমার মনে হয় নি! ভিতরে ভিতরে মানুষের মন আমার প্রতি এত সন্ধিগ্ধ হয়ে উঠেছে তা ত বুঝ্‌তে পারি নি! দুর্ভাবনায় আমার দেহ অবশ হ'য়ে এল। সেখান থেকে চলে আসবার ক্ষমতাটুকু আর আছে বলে মনে হ'ল না।

তারপর কি হ'য়ে গেল, জানি না! এক সর্ব্বনেশে আনন্দে আমার অণু পরমাণুও যেন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল! সে আনন্দের উত্তেজনায় আমার সমস্ত বুকখানি যেন ভেঙ্গে পড়ছিল।

সেই সমস্ত কথা শুনবার পর কতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম জানি না। যখন চলে আসবার ক্ষমতা হ'ল প্রায় তখন দরজার কাছে এসেছি, ঝড়ের মত ছুটে এসে সে ঐখানে লুটিয়ে পড়ল! সে যে কথা আমায় শুনাল, তা কি এইখানে লিখে রাখব? না থাক্, আমার বুকভরা কথা, আমার সর্ব্বস্ব দুটী কথা আমার বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে থাক্। তার পর দুই হাত দিয়ে শক্ত করে আমার বুকখানিকে চেপে ধরে চলে এসেছি।—আর সে? সে কি ঐ খানেই লুটিয়ে রইল!

কোন প্রকারে দেহটাকে টেনে বাড়ীতে এনে ফেললাম। এতকাল সুখ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, শুধু রং তুলি নিয়ে কাটিয়ে একি লাভ হ'ল আমার! কোথায় গেল সৌন্দর্য্য, কোথায় গেল কল্পনা! আমার সমস্ত বুকখানিকে শূন্য করে দিয়ে এমন করে কে আমায় ভিখারী সাজাল গো! এমন কর্ম্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন নিয়ে বাঁচ্‌ব কি করে?

সেদিন একটু ভাল আছি। জ্বর আসে নি। আমার কতকগুলি পুরান স্কেচ দেখছি, কিন্তু চোখের জলে সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাচ্ছে। দেবেন্দ্রবাবু এসে দুই হাত দিয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসি নি সুকুমার, তুমি ক্ষমা করে এত সহজে

আমাদের নিষ্কৃতি দিও না। একবার আমার সঙ্গে চল—বুঝি আর দেরী নেই।

আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম, তিনি একটী ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন, যাও।

কি এক ভয়ানক আশঙ্কায় আমার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠ্‌ল। ঘরে ঢুক্‌লাম। চারি দিকে সে কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! ঘরের এক কোণে একটী পালঙ্কে আমার মনে হ'ল যেন কেউ শুয়ে আছে। এ যে আমার নিরুপমা!

যন্ত্রচালিতের মত তার পাশে বস্‌লাম। তার কপালে হাত রাখলাম; সে আমার দিকে চাইল। কি করুণ ব্যথা ভরা সে চাহনি! তার রক্তহীন ঠোঁট ছুটী একবার কেঁপে উঠল। ডান হাতখানি বুকের ওপর এসে লুটিয়ে পড়ল। কি যেন সে বলতে চায়। আমি তার মাথাটী বুকে টেনে নিলাম। মনে হ'ল, সে বড় শান্তি পেল। মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি ফুটে উঠ্‌ল। চোখের কোণ হ'তে ক'এক বিন্দু জল গড়িয়ে আমার হাতের ওপর পড়ল, আমি তা বুকে মেখে নিলাম।

আমার মনে আর কোন খেদ নাই। আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল মৃত্যুর, স্নেহের স্পর্শে তা মুছে গেছে। আমি তাকে পেয়েছি, আমার জীবন ধন্য হয়েছে। এই আলোকে বাতাসে, জলে আকাশে, বিশ্বময় তাকে দেখি, তার স্পর্শ পাই। সে আমার অন্তর বাহির পূর্ণ করেছে। * * *

এইবার তুমি হয় ত তাঁর ঐ রকম অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছ? জ্যোতি, ঘটনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! শুধু তাই নয়, আবার তারও নাম নিরুপমা!

তুমি হয় ত ভাব্‌ছ, আমি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে এগিয়ে চলা বা ফেরা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সত্যি জ্যোতি, ফেরা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু আমার কাছে এগিয়ে চলাটাই সব চেয়ে সোজা বলে মনে হ'চ্ছে। তিনি তাঁর নিরুপমাকে সব দিয়ে ফেলেছেন, আমাকে দেবার আর কিছুই বাকি নাই তা জানি। কিন্তু আমার বুক ভরা যে সবই আছে, তাই দিয়ে কেন সে শূন্যতাকে ভরিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব না?

এক সপ্তাহ হ'ল, আমি একটা ছবি আঁক্‌তে আরম্ভ করেছি, আজ সেটা শেষ করলাম। আকাশ ভেঙ্গে ঝড় নাবছে, সমুদ্রের ঢেউগুলি পাহাড়ের গায়ের ওপর আছ্‌ড়ে পড়ছে। যদি কখনও আস ত দেখাব। আমি তখন ঢেউ-এর ওপর ফেনাগুলিকে রঙ দিয়ে একটু বশী করে ফুলিয়ে দিচ্ছি। আমার পিছনে চাপা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে ফিরে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! আমি রং তুলি বালির ওপর ফেলে সরে দাঁড়ালাম। তিনি অনেক্ষণ দেখে বল্‌লেন, আর ওর ওপর হাত দেবেন না। তার পর আমার রং-এর পাত্রটী তুলে নিয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, আপনাকে এ সব রং ব্যবহার করতে কে শেখাল? আমি বললাম, আমার গুরু। তিনি একটু যেন বিস্মিত হয়েই বললেন, গুরু! আমি বললাম, যদিও নিজে তিনি আমায় শেখান নি, কিন্তু আমি তাঁরই কাছে শিখেছি। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বল্লাম, পুরানের গল্পে শুনেছি—একলব্য তার গুরুর আকৃতি সাম্‌নে রেখে যুদ্ধ করতে শিখেছিল—একাই। আমিও সেই রকম—

আমার কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই তিনি জিগেস কর্‌লেন, কে আপনার গুরু?

আমি বললাম, আপনি।

পৃথিবী কাঁপিয়ে তখন ঝড় বইতে শুরু হয়েছে। ধুলায় চারিদিক ঢেকে গেছে। আমাদের পায়ের কাছে ঢেউগুলি চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে দু'এক বিন্দু জল আমাদের গায়ে এসে পড়্‌ছে। তিনি আমার কাছে সরে এসে দুই হাত দিয়ে আমার মুখখানি তুলে ধরে ডাকলেন, নিরুপমা! আমার সমস্ত দেহ সে কি ভয়ানক কেঁপে উঠ্‌ল; চকিতে একবার দেখে নিলাম তাঁর জলে ভরা চোখ দুটী আমার মুখের ওপর পড়ে আছে! ও ভাই জ্যোতি, সে চোখ দুটী কি সত্যি আমারই মুখের দিকে চেয়ে ছিল? আমাকে উদ্দেশ করেই কি সে নিরুপমা বলে ডেকেছিল? সত্যি করে বল জ্যোতি,—সে নিরুপমা কি আমি?

তোর নিরু

১৯১৮ সাল

ছবি দেখা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ

পুব আকাশে মস্ত বড় চাঁদ দেখে চমকে উঠলাম—তাই ত! রাত হ'য়ে গিয়েচে যে!

বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হ'য়ে পাহাড়ের নীচে এই পাথরখানার ওপর বসে' পড়েছিলাম। দিব্য মনোরম জায়গাটা। ওপরে অনন্ত নীল আকাশ আর নীচে সীমা-শূন্য সবুজ মাঠ। অথচ ঠিক মাঠও নয়, কারণ কোথাও কোথাও উঁচু হয়ে পাহাড়িয়া হয়ে উঠেচে; মাথায় যার ছোট বড় সাদা কাল কতকগুলো নুড়ি পাথর—আবার কোথাও বা এ নীচু হ'তে হ'তে একেবারে বাঁধ হয়ে বাঁধা পড়ে গেছে—বর্ষার জল যার মধ্যে এখনো চিকচিক করচে। এখানে ওখানে সেখানে এই মাঠের মধ্যে খানকতক মাটীর ঘর আর গোটা কতক গাছপালা নিয়ে এক এক-খানা গাঁ এদের। দেখতে দেখাচ্চে যেন একখানি ছবি।

আশে পাশে গাছের মাথায় পাখীর দল কিচির মিচির করচে। কি তাদের কথা তারাই জানে কিন্তু তাই জানাতে এই শান্ত সন্ধ্যাটা তারা কলরবে মুখর করে তুলেচে।

সামনের পথ দিয়ে কত রকমের কত লোক চলা ফেরা করচে। মনে হচ্চে যেন বায়স্কোপ দেখচি—এদের কাউকে ত চিনি নে—জীবনের কোন কথাই ত এদের জানি নে।

বেলা পড়ে' এসেচে। আকাশে রঙের ছড়াছড়ি কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েচে—নীচে গাছের মাথায় বাঁধের জলে মানুষের চোখেমুখে তার লালিমা গলে' পড়চে।

সুন্দর!

বাঁ হাতে একটা ঝুঁড়ি রাস্তা দিয়ে তিনটী মেয়ে জল আনতে যাচ্চে। কালো তাদের গায়ের রং—চুলে তাদের ফুলের বাগান। চোখে তাদের হাসি, কণ্ঠে কাকলি। তারা চলেচে হেলতে দুলতে গমকে ঠমকে, আর এমনি ভাবে হাসাহাসি করচে যে, আমার ভয় হচ্চে বুঝি বা মাথার কলসিটার কথা তারা ভুলে গিয়েচে।

তারা চলে গেল। পিছে পিছে এল একপাল মোষ। লম্বা ছেঁড়া কোরতা গায়ে, ছোটবড় তিনটে রাখাল ছেলে সেই মোষের পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরচে। এদের মধ্যে যে বড় সে তান ধরে দিয়েচে একটা মোষের পিটে শুয়ে—মেঠো সুরের মিষ্টি মধুর আওয়াজটা বেশ লাগচে। আর একজন সেও একটা মোষের পিঠে বসে ঐ মোষেরই পিঠে তাল রাখচে ঐ গানের। সব ছোটটা মস্তবড় একগাছা পাচন হাতে করে এ-দিক ও-দিক ছুটোছুটি করতে করতে মোষগুলোর খবরদারি করচে।

পথের দিকে চেয়ে দেখি হাট ভেঙে লোক সব ফিরচে। কত রকমের কত লোক, হাতে মাথায় পিঠে কাঁধে কাঁধে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ঝুলিয়ে দুলিয়ে বসিয়ে নিয়ে ফিরচে—একা দলে মিলে গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে। কেউ বা গম্ভীর ভাবে চলচে মনের গরমে বা মনমরা মরমে।

যুবক চলচে কাল কুচকুচে তার বাবরি বাঁধা চুলে টিনের ফেটি এঁটে—পড়ন্ত রোদ লেগে যা চিকমিক ঝিক-ঝিক করচে। হাতে তার লম্বা লাঠি, মালকোচা বাঁধা

কাপড়। গায়ে জামা নেই তার বদলে আছে লাল নীল ঝালর দেওয়া মোটা একখানা করে চাদর, ডান হাতের নীচে দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর ফেলা। কোলাহল করতে করতে কসরৎ ভাঁজতে ভাঁজতে এরা চলেচে।

মাঝে যাচ্চে বুড়োরা, গায়ের চাদর টানতে টানতে পিঠ দুমড়ে ঘাড়মুড় ভেঙে পড়তে পড়তে। তারা চলচে আর ঘন ঘন তামাক টানচে।

পেছনে যাচ্চে বুড়িরা। সামনের ফুকো হাওয়ার মুখে তাদের পা উঠচে না—তবুও চলতে হচ্চে।

যুবতীর পিঠে বাঁধা ছেলে, মাথায় বসান পশরা। নিজেদের মধ্যে কলকল খলখল গলগল করতে করতে চলেচে ভাদ্রের ভরা নদীর মত।

এদের পেছনে চলেচে তরুণীর দল। আগে পাছের সকলের মশকরা শুনতে শুনতে, আপনা আপনি গা টেপাটেপি করতে করতে, এরা হাঁকিয়ে চলচে, ঝাঁকিয়ে হাসচে। আকাশে বাতাসে লহর তুলে সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ক্ষণেক্ষণে এরা তান ধরচে। কথা তার ঠিক বোঝা যাচ্চে না, ব্যথাও হয় ত কোন্ অতলে তলিয়ে আছে—শুধু কানের কাছে ভেসে আসচে এদের ফুল্ল প্রাণের অমূল্য হাসির রেশ টুকু।

দলের পরে দল, হাসির পিছে হাসি, কথার পিঠে কথা, সুরের ফাঁকে সুর। হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গিয়েচে—তান ধরেচে তরুণী আর তারই তালে তালে নাচ্‌চে তরুণ। মনমাতান সব-ভোলান এই ঐক্যতান।

হঠাৎ একটা হল্লা শুনে স্বপ্ন ছুটে গেল—দেখলাম ছায়ামূর্ত্তির মত আপদ মস্তক কোরতা মোড়া হাওয়াখাওয়া বাবুর দল চুরুট মুখে হন্‌হন্ করে চলতে চলতে এক ফাঁকে হো হো শব্দে হেসে নিচ্চেন।

এ হাসির আওয়াজই আলাদা।

সব ভেস্তে গেল। আমি উঠে পড়লাম। দেখলাম, রাত হয়ে গিয়েচে—পূব আকাশে মস্ত বড় চাঁদ মুখ টিপে টিপে হাসচে যেন আমার দিকে চেয়ে।

দুষ্ট হাসি।

শ্মশান

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

কুহেলির হিমশয্যা অপসারি ধীরে
রূপময়ী তন্বী মাধবীরে
ধরণী বরিয়া লয় বারে বারে বারে !
—আমাদের অশ্রুর পাথারে
ফুটে ওঠে সচকিতে উৎসবের হাসি,
অপরূপ বিলাসের বাঁশী
ভগ্ন-প্রতিমারে মোরা জীবনের বেদীতটে আরবার গড়ি,
ফেণাময় সুরাপাত্র ধরি'
ভুলে যাই বিষের আস্বাদ !
মোহময় যৌবনের সাধ
আতপ্ত করিয়া তোলে স্থবিরের তুহিন-অধর !
চির-মৃত্যু-চর
হে মৌন শ্মশান,
ধূম-অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে আবরি' বয়ান
হেরিতেছ কিসের স্বপন !
ক্ষণে ক্ষণে রক্ত-বহ্নি করি নির্ব্বাপন
স্তব্ধ করি রাখিতেছ বিরহীর ক্রন্দনের ধ্বনি !
তব মুখপানে চেয়ে কবে বৈতরণী
হয়ে গেছে কলহীন !
বক্ষে তব হিম হয়ে আছে কত উগ্রশিখা চিতা
হে অনাদি পিতা !
ভস্মগর্ভে—মরণের অকূল শিয়রে
জন্মযুগ দিতেছ প্রহরা !
কবে বসুন্ধরা
মৃত্যুগাঢ় মদিরার শেষ পাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে তব,—কবে লবে টানি'
কঙ্কাল-অঙ্গুলি তুলি' শ্যামা ধরণীরে
শ্মশান তিমিরে !
লোলুপ নয়ন মেলি' হেরিবে তাহার বিবসনা শোভা
দিব্য মনোলোভা !
কোটি কোটি চিতা-ফণা দিয়া
রূপসীর অঙ্গ আলিঙ্গিয়া
শুষে নেবে সৌন্দর্য্যের তামরস-মধু !
এ বসুধা-বধূ
আপনারে ডারি দেবে উরসে তোমার !
ধক্ ধক দারুণ তৃষ্ণার
রসনা মেলিয়া
অপেক্ষায় জেগে আছে শ্মশানের হিয়া !
আলোকে আঁধারে
অগণন চিতার দুয়ারে
যেতেছে সে ছুটে' !
তৃপ্তিহীন তিক্ত বক্ষপুটে
আনিতেছে নব-মৃত্যু—পথিকেরে ডাকি,'
তুলিতেছে রক্ত ধূম্র আঁখি !
নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শুধু
বৈতরণী মরু ঘেরি' জলে যায় ধূ ধূ !

আসে না প্রেয়সী !
নিদ্রাহীন শশী
আকাশের অনাদি তারকা
রহিয়াছে জেগে তার সনে,
শ্মশানের হিম-বাতায়নে
শত শত প্রেত-বধূ দিয়ে যায় দেখা !
তবু সে যে পড়ে আছে একা
বিমনা বিরহী !
বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দহি' !
কত শৌর্য্য—সাম্রাজ্যের সীমা
প্রেম পুণ্য পূজার গরিমা
অকলঙ্ক সৌন্দর্য্যের বিভা
গৌরবের দিবা !
তবু তার মেটে নাই তৃষা !
বিচ্ছেদের নিশা
আজো তার হয় নাই শেষ !
অশ্রান্ত অঙ্গুলি সে যে করিছে নির্দ্দেশ
অবনীর পক্ক-বিম্ব-অধরের পর !
পাতা-ঝরা হেমন্তের স্বর
করে দেয় সচকিত তারে !
হিমানী-পাথারে
কুয়াশা-পুরীর মৌন জালায়ন তুলে'
চেয়ে থাকে আঁধারে অকূলে
সুদূরের পানে !
বৈতরণী খেয়াঘাটে মরণ-সন্ধানে
এল কি রে জাহ্নবীর শেষ ঊর্ম্মিধারা !
অপার শ্মশান জুড়ি' জ্বলে লক্ষ চিতা-বহ্নি—কামনা-সাহারা !

প্রভুপাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমাদের বংশের একটা চল্‌তি প্রবাদ ছিল যে, প্রত্যেক সাত পুরুষে একজন করে সিদ্ধ হবে। তাই আমি যখন স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু না বলে শ্রীধাম নবদ্বীপের বড় আখড়ায় মোহান্ত প্রভুপাদ নরোত্তমদাস বৈরাগী জীউর শিষ্য হয়ে পড়লাম, তখন কেউই অবাক্ হয়ে গেল না।

সে ঘটনাটা আমার বেশ মনে আছে। যাদব মাইতির বুড়ো মাকে অন্তিম সময়ে পদরজ দিয়ে নিত্যধামে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতেই প্রভুপাদ আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। অনেকেই হাত দেখাতে, রক্ষে কবচ করাতে, নেহাৎপক্ষে একটু পাদোদক আন্‌তে ছুটে চল্‌ল। দুই এক দিন যেতে না যেতেই প্রভুপাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনতে পেলাম। কেউ বল্‌ল, তিনি এক গলা দিয়ে সাত রকম স্বর বের করতে পারেন। কেউ বল্‌ল, ভাল করে তাকালে তাঁর কপালে একটা চোখ দেখা যায়। আবার কেউ বল্‌ল যে, অনেক রাত্তিরে নাকি তিনি আসন থেকে সাড়ে তিন হাত উঁচু হয়ে শূন্যের উপরে বসে থাকেন ইত্যাদি। এ যাবৎকাল অনেক মহাত্মাই দেখেছি এবং তাঁদের চরণতলে বসে উপদেশ গ্রহণের সুযোগও ঘটেছে কিন্তু এমনটির কথা কুত্রাপি শুনি নাই। কৌতূহলে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সকল সঙ্কোচ দ্বিধা দূরে ঠেলে ফেলে সেই ভরা রোদ্দুরেই ভিজে গামছাখানা মাথায় দিয়ে প্রভুর নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রভুপাদকে দেখে বুঝলাম যে, হাঁ, বড় আখড়ার মোহান্ত বটে! যাদবের বারান্দার অর্দ্ধেক জুড়ে প্রভুর আসন। ছোট্ট একটি গদি, তারপরে ধবধবে সাদা বিছানার চাদর, চারিপাশ মোটা চারটে তাকিয়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে নরনারায়ণরূপে বিরাজ করছেন স্বয়ং প্রভুপাদ। মুণ্ডিত মস্তক, তার মাঝে একগোছা দীর্ঘ শিখা, মুখ দাড়ি গোঁফহীন, নাসাগ্রে রসকলি, গলায় ত্রিকণ্ঠি, পরিধানে ডোর, কৌপীন, বহির্ব্বাস, সর্ব্বাঙ্গে 'হরে মুরারে' ইত্যাদির ছাপ। প্রথম দর্শনেই নজর পড়ল প্রভুর ত্রিকণ্ঠির উপরে। যেমন বিরাট তার অবয়ব, তেমনি জাঁকালো তার রূপ! মহাপুরুষদের নাকি বয়েস ঠিক

করা শক্ত। তবুও আমার স্থূল চোখে যা দেখলাম তাতে প্রভুকে ষাট-এর কাছাকাছি বলে বোধ হল।

প্রভু তখন সবে 'শীতলী ভোগ' শেষ করে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করছিলেন। ভক্তমণ্ডলী তখনও 'প্রসাদ কণামাত্র' নিয়ে ব্যস্ত। এই অবস্থায় আমি গিয়ে হাজির হ'লাম। প্রভু 'গ্রন্থ' থেকে চোখ তুলে যেন আমার দিকেই চেয়ে বল্লেন,—তুই এসেছিস্?

আমি কিন্তু এরূপ সম্বোধনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই পিছন ফিরে আশে পাশে দেখছিলাম আর কেউ এল কিনা। প্রভু পুনরায় কণ্ঠস্বরে দরদমিশিয়ে সোচ্ছ্বাসে—গোপীকিশোর, রাধানাথ, ব্রজবল্লভ আমার, তুই এসেছিস? আমি যে তোরই জন্যে কত যুগ যুগ ধ'রে পথ চেয়ে ব'সে আছি—বলে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ভাবাবেগে আমাকে একেবারে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ ক'রে ফেললেন। সাধুর পরশে আমার কাচ দেহ কাঞ্চন হয়ে গেল।

এইরূপ ভাবসমাধিতে বোধ করি মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তারপর প্রভুপাদ আমার হস্তরেখা বিশ্লেষণ করতে করতে কতকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন,—যা ভেবেছি তাই না হয়ে যায়ই না! মহাপুরুষের লক্ষণ সমস্তই বর্ত্তমান, কেবল দীক্ষা শিক্ষার যা একটু অভাব।

পরে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—তা' সে দিক দিয়ে তোর কোন চিন্তা নাই, বুঝলি? যদি গুরুর কৃপা হয়, অসম্ভব কিছু নয়। গৌরাঙ্গ যখন আমার কাছে এনে ফেলেছেন, তখন আমি তোকে সাধারণ 'জীব'-এর মত এই সংসার নরকে হাবুডুবু খেয়ে মরতে ফেলে যেতে পারবো না। তা করলে গুরুর কাছে আমার অপরাধ হবে যে!

প্রভু হাত দু'খানি যোড় করে গুরুর উদ্দেশে কপালে ঠেকালেন।

আমার মনের ভাব তখন কি হয়েছিল জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, প্রভুকে আমার বড় ভাল লেগেছিল। ছেলেবেলা থেকে অনেক পীর, পয়গম্বর, সাধু, মহাত্মা, গোঁসাই, বাবাজীর কাছে গিয়েছি কিন্তু এমন সার কথা কারো কাছ থেকে পাই নাই। অনেক কথাই আমার প্রভুকে ব'লে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু পেরে উঠলাম না। জানি না প্রেমের আধিক্যে কিনা গলাটা আমার ব'সে গেল, চোখ দুটো জলে ভ'রে এল। প্রভু আমার দিকে চেয়ে ধরে দিলেন,—'গৌর প্রেমের প্রেমিক যে জন হয়, কথা কয় বা না কয়, ও সজনি, তারে দেখলে যায় চেনা'—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। মুখপদেই থেমে যেয়ে জিগ্যেস করলেন, পারবি ত রে? কিন্তু সে যে বড় শক্ত!

কি পারবো এবং কি শক্ত কিছুই বুঝতে না পেরে প্রভুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি জিগ্যেস করলেন, বিয়ে করেছিস?

আজ্ঞে না।

বেশ করেছিস। দ্যাখ, এই যে সংসার, এটা হল সমুদ্দুর, আর ঐ যে মেয়েমানুষগুলো দেখ্‌ছিস ওরা হচ্ছে কুমীর। ফাঁক পেলেই ঘাড় মট্‌কাবে। তবে যারা ভাবুক, তত্ত্ব জেনেছে, তারাই ওদের খেলাতে পারে। কিন্তু তা যার তার কর্ম্ম নয়:—

মন আমার ভাব না জেনে প্রেমনদীতে ঝাঁপ দিয়ো না।
সে যে অকূল পাথার ডুব দেওয়া ভার
সাঁতার দিলে আর কূল পাবা না।
মন আমার র্‌-র্‌ . . .

হ্যারে, তোর আর কে আছে?

আজ্ঞে, সবই আছে, মা, বাপ—

কেউ নয়, কেউ নয়, ওরা তোর কেউ নয়। নরকের কীট, হাত ধরে নরকে নিয়ে যাবে! এখনও সময় আছে। যদি বাঁচতে চাস্ ওদের ছাড়্।

কোথায় যাবো, প্রভু?

কেন ধামে! সৎগুরু ধর, সাধু সঙ্গ কর। হয় ত এই জন্মেই হয়ে যাবে।

গুরু কোথায় পাবো! এ অধমকে কি আর কেউ দয়া করবে?

অধম তরাতেই ত আমাদের জন্ম। জানিস্ নে

রামচন্দর অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন? কত শত পাপী—

এদিকে এক কাণ্ড ঘটে গেল। পাশের ঘর থেকে যাদব চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল যে, তার মায়ের 'অন্তিম' সময় উপস্থিত। প্রভুপাদ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। রুগীর ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন যে, যে জন্যে তাঁর আসা তা' যখন শেষ হতে চল্ল তখন তিনি আর এক মুহূর্ত্তও 'নরলোক'-এর মাঝে থাক্বেন না। অতএব আমার যদি বিন্দুমাত্রও পরমার্থলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা' হলে তাঁর সাথে যেতে পারি। আমিও যাবো বলে মনস্থির ক'রে প্রভুকে কথা দিয়ে চলে এলাম।

* * * *

প্রভু বলে দিয়েছিলেন 'মঙ্গলের উষো বুধে পা, যথা ইচ্ছে তথা যা'। তাই বুধবার সকালেই মাত্র গামছায় কাপড়খানি বেঁধে যাদবের আঙ্গিনায় এসে হাজির হলাম। প্রভু ঠিক ঠাক হয়ে সেজেগুজে বসে ছিলেন। বাহন কিষ্টোদাস 'থ'ড়ের' বহর দেখেই হোক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক, আগে থাক্তেই ভেগে গিয়েছিল। কাজেই থ'ড়েটি এসে চাপ্‌ল আমার ঘাড়ে। আমার অবিশ্যি তাতে কোন আপত্তি ছিল না। সাধুর কাজে আমার এই নশ্বর দেহ লাগবে, সেও পরম সৌভাগ্যের কথা!

যাক্, এখন এই থ'ড়ে জিনিষটি সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী আবশ্যক। একটা কোল-বালিশের অড়ের মাঝামাঝি হাতখানেক ফেড়ে দুই দিকের ভার কেন্দ্র ঠিক রেখে জিনিষপত্তর বোঝাই দিয়ে কাঁধে ফেললে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই থ'ড়ে পদার্থটিও ঠিক তাই। এক কথায় একে ব্যাগের আদিম সংস্করণ বলা চলে। প্রভুপাদ তাঁর গেরুয়া রংয়ের থ'ড়েটির ভিতর তামাক সেবার জন্যে নারকেলের ছোবড়া থেকে আরম্ভ করে, 'পাত্তর' 'মহাপাত্তর' নামের থলি প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব চাপিয়ে দুই হাত দিয়ে অতিকষ্টে মাটি থেকে ইঞ্চি তিনেক উঁচু করে বললেন যে, ভার এমন বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমার কিন্তু কাঁধে করে প্রভুকে যা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল, তা বলে আর পাপের বোঝা ভারী করতে চাই না।

যা' হোক, দুইজনে রওনা হলাম—প্রভু আগে আমি পিছনে। বাড়ী থেকে কয়েক পা' গিয়েই প্রভু যথাক্রমে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং বামনাসারন্ধ্রে তর্জ্জনী স্থাপন করে, দুই একবার শ্বাস প্রশ্বাস টেনে বললেন যে, 'হাওয়া ভাল'। আমি এই 'হাওয়া ভাল' কথাটা সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে প্রভুর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, ও, তোরা ত এসব বুঝবি না, সাংসারিক জীব। দ্যাখ্, আমরা আগে থাকতেই জানতে পারি যাত্রা ভাল হবে কি মন্দ হবে। তা' আমাদের আজকের যাত্রাটা বেশ ঠিক সময়েই হয়েছে।

চল্‌তে লাগলাম। পাকা ছয় 'কোশ' পথের ভিতর উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। শেষে গঙ্গার ধারে পৌঁছে প্রভু তামাক 'ইচ্ছে' করবার বাসনা জানালেন। সেজে দিলাম। প্রভু খেয়ে কল্কেটা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, সেবা কর্।

আমি জানালাম যে, আমি তামাক খাই না।

প্রভু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, তোকে দেখছি একেবারে হাতে খড়ি দিতে হবে। এতখানি বয়েসের ভিতর তামাক সেবাটাও শিখতে পারিস্ নাই। তামাকের গুণ যদি একবার জান্‌তিস! কথাই বলে—

তেল তামাক পিত্তিনাশ
যদি করে বারো মাস,
যদি করে মধ্যি মধ্যি
তা হলে হয় পিত্তি বৃদ্ধি।

তামাকের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিলাম যে, ও জিনিষটা আয়ত্ত করবার সুযোগ আমার হয় নাই।

প্রভু অনন্যগতিক হয়ে কল্কেটা আর একবার হুঁকোর মাথায় চড়িয়ে গোটা চারেক ফাঁকা টান টেনে রেখে দিলেন। পরে থ'ড়ের ধারে সরে এসে এ-পাশ ও-পাশ খুঁজে একটি ছোট্ট পুঁটলি ও কমণ্ডলুটা নিয়ে দূরে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওপারে নবদ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। চার পাঁচটা বাঁধা

ঘাট—প্রত্যেক ঘাটে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। বর্ষা তখন সবে সুরু। পাশের একটা নদীর কালো জল ভাগীরথীর ঘোলা জলের সাথে মিশে এক অপূর্ব্ব ধবল-কৃষ্ণের সংমিশ্রণ করেছে। দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। এই সেই নবদ্বীপ। এর প্রতি রেণুতেই চৈতন্যের স্মৃতিজড়িত, এই খানেই চৈতন্য তাঁর সাম্যমন্ত্রের প্রভাবে বাংলার বুকে এক ভাবের তরঙ্গ—

হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রভুপাদ ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু একেবারে নটবর বেশে। বহির্বাসের বদলে আহিরী নাগরী ধরণে ঘাঘরা পরা, নগ্নগাত্রে আঙ্গিয়া ও ওড়না, ওড়নার কতকটা মাথায় ঘোমটায় পরিণত। চিবুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখে সলজ্জ হাসি, চোখে বাঁকা চাহনি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ক্ষণেকের জন্যে মনে হল বুঝি সেই 'আদিম বসন্ত প্রাতে' প্রভু নারায়ণ এই মদনমোহন বেশেই যুদ্ধ নিরত দেবাসুরকে শান্ত করেছিলেন।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। প্রভুপাদ অন্তর্য্যামী, মনের সমস্ত খবরই পেলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন, কিরে, বড় হতভম্ব হয়ে গেছিস্, না? ছাখ্, এ সব হচ্ছে গোপীভাব, সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাব। শত সৌতিসনকাদি ঋষিরা জন্ম জন্ম তপস্যা করে যা না করতে পেরেছে, এই গোপীরা করেছে তা' একজন্মেই।

তারপরে একটু সুর টেনে আরম্ভ করলেন, গোপী ভাবের গোলাপী খিলি আনন্দে কর্ চর্ব্বণ, বাবু সাজরে মন!

কড়া রোদ্দুরে গাঙের ধারে বসে গোপীভাব আলোচনা করবার জায়গা নয়। প্রভু বোধ হয় তাঁর ভুলটা সমঝে ফেল্লেন। এদিকে খেয়াও এসে পড়েছিল। তাই খ'ড়েটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন, নে এইবার ওঠা। ও সব পরে হবে' খন।

আঙ্গিনায় পা দিয়ে প্রভুপাদ ডাকলেন, ধ্রুব, অ ধ্রুব, ধ্রুবতারা!

ধ্রুবতারা এলেন। বয়েসটা তাঁর বেশী না হলেও যৌবনটা ভাটার দিকেই গড়াচ্ছিল। তিনি কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দেন নাই। এগোতে পারেন বা না পারেন অন্তত জায়গায় খোঁটা গাড়বার জন্যে বেশ ধস্তাধস্তিই করছিলেন। এ ভাবটা তাঁর রসকলির বহর এবং পান দোক্তার বসে ঠোঁট দুখানি একটু বেশী মাত্রায় রাঙা করে রাখবার ধরণেই বেশ বোঝা যায়। যাক্, মোটের উপর ধ্রুবতারা এলেন এবং সামনেই আমার মত একটি কিম্ভূতকিমাকার জীবকে দেখে একটু হতভম্ব হয়ে চকিতেই সাম্‌লে নিয়ে বলে উঠলেন, বাবা-গোঁসাই, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলি কখন্ এসেছি. একটু খোঁজও কি নিতে নেই? তারপর খবর কি?

খবর! সে দিন জল তুলতে পাত্‌কো' তলায় পড়ে গিয়ে এইখেনে—

আমি ওসব জিগ্যেস করছি না। বলি এ দিককার খবর কি?

খবর আর কি! ভ্যালা ফ্যাসাদেই পড়েছি বাবা! দিন রাত্তির কেবল ঘ্যান্‌ঘ্যানানি। সেই থেকেই বলছি, বাবা-গোঁসাই, ও বেরাল তুমি পার কর। তা' আমার কথায় ত তুমি কান পাতবে না। কি চোখেই যে তুমি ওকে দেখেছ! এই নবদ্বীপের মত যায়গায়—

আচ্ছা, আচ্ছা, তুই একটু তামাক সেবা করা দিকি।

ধ্রুবতারা আর কিছু না ব'লে কল্কে হাতে তামাক সেবার জোগাড় দেখতে চ'লে গেলেন।

* * *

প্রভুপাদের আশ্রমে দিনগুলো এক রকম মন্দ কাটিতে লাগলো না। সকাল বেলায় উঠেই 'বাল্যসেবা' অর্থাৎ গরম গরম মাড় ভাত, দুপুর বেলায় প্রভুর ভোগরাগের প্রসাদ, বৈকালে শীতলীভোগ, সেও এক বিরাট ব্যাপার, রাত্তিরে 'মালপো' ভোগ ও মাল্‌সা ভোগ, সে ত আছেই। বামুণের ছেলে, বাড়ীতে এক সূর্য্যে মা-লক্ষ্মীর অংশ দুই-বার ত পেটে যেতই না। পরন্তু উপরি যদি কদাচিৎ কিছু জুটত ত একটা কচি শশা কি দুটো ডাঁশা পেয়ারা। যাক্, ফলে আমার চেহারার বেশ একটু পরিবর্ত্তন হলো। কিন্তু একটানা সুখ ত মানুষের বরাতে জুটবার জো নাই। সমস্ত

দিন খেয়ে খরচে যেটুকু জমাতাম, রাত্তিরে মশার কল্যাণে সেটুকু ত যেতই, তা' ছাড়া সাবেক জমার তহবিলেও যেন হাত পড়তে লাগলো। শেষে নিরুপায় হয়ে প্রভুর কাছে একখানা মশারির 'নিবেদন' জানালাম। প্রথমে প্রভু যথেষ্ট আপত্তি করলেন, ব্রহ্মচারীর কোন মতেই বিলাসিতা শোভা পায় না। কিন্তু আমি যখন একেবারে নাছোড় বান্দা হয়ে পড়লাম, তখন অগত্যা গঙ্গার ধারে শ্মশান দেখিয়ে, ওখানে ভাল ভাল মশারি পাওয়া যায়, বলে প্রভু আপাতত কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করলেন। উপদেশটার ব্যয় সংক্ষিপ্ত হলেও আমি কিন্তু পালন করে উঠ্‌তে পারলাম না। এইখানেই প্রথম গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলাম।

প্রভুপাদের সংসারে ছিলেন তাঁরা ঘরে বাইরে ছুইজন, ধ্রুবতারা, শ্যামলী, ধবলী, হরিদাস ও গুরুদাসী। এর মধ্যে শেষোক্ত চারটি যথাক্রমে গোরু, বাছুর, কুকুর, বিড়াল ও মা-গোঁসাইর আশ্রিত। অবলাজাত বলে মা-গোঁসাই এদের পর বড় সদয় ছিলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানেই রাখ্‌তেন। বিষ্টোদাস থাক্‌তে সে-ই এদের কাজকর্ম্ম দেখতো। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি তার স্থলাভিষিক্ত বলে এরা আমার স্কন্ধেই চাপলেন। গো-সেবায় অবিশ্যি আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না; কেননা সকাল বেলায় দুই 'চাড়ি' জাব্‌না দিয়ে আর গোয়ালটা পরিষ্কার করেই নিষ্কৃতি পেতাম, তা' ছাড়া এতে প্রভুর মতে পরকালের কাজও হত বিস্তর। গুরুদাসীও লোক ভাল—শীগ্‌গিরই বশ মানল। তবে মহিলা জাতীয় বলে মাঝে মাঝে একটু বেঁকে বসলেও সেটা কিছু ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু যত মুস্কিলে পড়লাম ঐ ব্যাটা হরিদাসকে নিয়ে। সে যাতে কোন প্রকার অখাদ্য না খায়, এবং গলার তুলসীর মালা ছিঁড়ে না ফেলে এই সম্বন্ধে মা-গোঁসাইর কড়া হুকুম ছিল। কিন্তু হলে কি হবে, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। ব্যাটা নেহাৎ কুকুর কিনা, ফাঁক পেলে দুটি অপকর্ম্মই বেশ সুচারুরূপে করে একেবারে সোজা মা-গোঁসাইর সামনে এসে হাজির হতো। ফলে মালসা ভোগের সাথে সাথে মা-গোঁসাইর দাঁত খিচুনি আমার দৈনিক পাওনার তালিকাভুক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

প্রভুপাদ কয়দিন আমার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আমাকে ডেকে বল্‌লেন, তাই ত হে, তোমাকে ত আর এ ভাবে রাখা যায় না।

আজ্ঞে কি হয়েছে?

তোমাকে ভেক্‌ নিতে হবে। শাস্ত্রে কি বলে জান? যে ভেক্‌ নেয় নি, তার হাতের গঙ্গাজল দিয়ে ইয়েও করা যায় না। তবে তুমি আমার বাড়ী আছ এই জন্যে এত দিন চলছে। কিন্তু এ ভাবে আর বেশী দিন থাক্‌লে সমাজ ত ছেড়ে কথা কইবে না।

প্রভুপাদ এমন ভাবে কথা গুলো বললেন যেন আমি তাঁর আইবুড়ো মেয়ে, ঘাড়ে চেপে আছি। কোন প্রকারে পার করতে পারলেই বাঁচেন।

উত্তর করলাম, কিন্তু আমি যখন কেষ্টোমন্তরে, তখন আমাকে বোষ্টমই বল্‌তে হবে। তবে—আমার গলায় পৈতে আছে এই যা তফাৎ।

শোন কথা! তুমি ভেক্‌ নেবে না, গলায় পৈতে রাখবে, অথচ তুমি বোষ্টম। কোন্‌ শাস্তরে এসব পেলে বল দিকি?

শাস্ত্র আমার জানা ছিল না, দেখাতেও পারলাম না। প্রভুপাদ বেশ সুযোগই তাতে পেয়ে গেলেন। বাংলায় সংস্কৃতে তিনি অনেকগুলি নজির খাড়া করলেন, যদিও এর বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণের উপর বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করছিল। প্রভুপাদকে চিনতাম। তাঁর কথার উপর কথা বলে যে বিশেষ কোন ফল হবে না, তাও জানা ছিল। কাজেই আর কোন আপত্তি না করে পবিত্র চৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করবার জন্যে নির্ব্বিবাদে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। প্রভুপাদ তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন, এই ত চাই! সংসার বন্ধন ছিঁড়ে কেটে বেরোবার সময় এই রকম দুর্ব্বলতা আসেই বটে। কিন্তু একে যে জয় করতে পারে সে-ই মানুষ, সেই বীর।

প্রেমানন্দে আমার দুই চোখ ছল ছল করে এল।

ব্রাহ্মণের উপনয়নের মত ভেক্‌ বৈষ্ণবের সংস্কার-

বিশেষ। পার্থক্য এই যে, উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ তার পূর্ব্বের সমস্তই রাখতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি পিতৃদত্ত নামটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হয়। এই হিসেবে আমারও পরবার কাপড়, মাথার চুল এবং ট্যাঁকের সওয়া বারো আনা পয়সা সমস্তই ছাড়তে হল। চুল গোঁফ কামিয়ে চেহারা যা দাঁড়াল, তা দেখে কান্না পেলেও এক রকম সহ্য করে গেলাম। কিন্তু নতুন নাম-করণটিতে কিছুতেই খুশী হতে পারলাম না। প্রভুপাদ আজকাল বড়ই সন্তুষ্ট। সময়ে অসময়ে তাঁর খুঁটিনাটি সমস্ত কাজেই আমাকে দরকার। কিন্তু হলে কি হবে! মা-গোঁসাই সাথের কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠ্‌তে পারছিলাম না। আমার পর তাঁর বিরক্তি যেন দিন দিনই বেড়ে যেতে লাগল। প্রভুর আদেশ ছিল যেন সন্ধ্যারতির পর কেউ আঙ্গিনায় পা না দেয়। মা-গোঁসাই বল্‌লেন, ওসব কিছু নয়, ভুয়ো! চৈতন্যদাস বাবাজীকে আস্‌তে দিতেই হবে। তাঁর মুখের হরিগুণাগুণ গান না শুনলে রাত্তিরে তাঁর ঘুমই হবে না। ফলে বাবাজী আসেন, মা-গোঁসাইর ঘরে ধূপ, ধূনো পোড়ে, আর তিনি চক্ষু বুজে নামামৃত পান করেন। প্রভু আড়ি পেতে দেখেন আর ঝাল ঝাড়েন আমার উপর। মা-গোঁসাই ভাবেন, সমস্তই আমার কারসাজী। অথচ তাঁরা পর্দ্দার বাইরে এসে কিছুই খোলসা করে নেবেন না।

দিন কতক দেখে শুনে প্রভুপাদ নিবিষ্টচিত্তে আহ্নিকে মন দিলেন। ধ্রুবতারা যোগাড় গোছাল করে দেয়। ঘরে আমারও পর্য্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। প্রভু সন্ধ্যেবেলায় ঢোকেন, আর কখন বেরোন তা জানতেও পারি না। চৈতন্যদাস বাবাজী নিয়মমত আসেন, আমি দরজা খুলে দেই আর বাইরে বসে চাপড় মেরে মশা তাড়াই।

দিন এমনি যতই যেতে লাগলো, প্রভুপাদ ততই আহ্নিকে মেতে উঠ্‌তে লাগলেন। আজকাল দিনরাতই ঠাকুর ঘরে থাকেন, সেবাকার্য্যও বুঝি তার মাঝে সমাধা হয়। আমার আর কেউ খোঁজ খবর নেয় না। ধ্রুব-তারাই প্রভুর বড় অন্তরঙ্গ। সে সাউকড়ী করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর আমার দিকে আড় চোখে চায়। রাগে আমার গা জলে ওঠে। আর দুই দিন পরে আমিই হব মোহান্ত, অথচ কিনা আমাকেই গ্রাহ্য করতে চায় না। কিন্তু এ নালিশ করি কার কাছে! প্রভুর ত দেখাই পাই না। ঠাকুর ঘর দিন রাত্তিরই বন্ধ থাকে।

সেদিন সকাল বেলায় হঠাৎ ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু বেরিয়ে এলেন। মনে করলাম বুঝি আবার এখনই দরজা বন্ধ হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তা কিছুই হল না। প্রভু কাছে এসে বললেন, আজ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিরোভাবের দিন, অতএব কিছু ফুল সংগ্রহ করা দরকার। আমিও যে আজ্ঞে, বলে সাজি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।

পূজো শেষ হয়ে গেল। প্রভু আমাদের ভোগরাগের প্রসাদ বেটে দিচ্ছিলেন। আজকের মত আগে কোন দিন এমন করে ঠাকুর ঘর দেখবার সুযোগ পাই নাই। যতদূর জানি, ঘরটি বাড়ীর অন্যান্য ঘরের একেবারে শেষের দিকে অবস্থিত এবং বিশেষ প্রশস্তও নয়। প্রায় মাঝখানে টাকপড়া মানুষের মাথার মত চন্দনসিক্ত তুলসী ও পুষ্প-ভূষিত একটি নাতি বৃহৎ মাটির ঢিঁপি; বোধ করি বা প্রভুর উপাস্য দেবতাই হবে। ঘরের মধ্যে পূজোর সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র নাই। অথচ এরই মাঝে প্রভু দিন রাত্তির কাটিয়ে দেন। ও পাশের দেওয়ালের গায়ে বেশ বড় একটা দরজা। প্রভুপাদ বলেন, ওটা প্রকৃত দরজা নয়, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন্ এক মোহান্ত বাবাজীর অদ্ভুত চিত্রাঙ্কণ বিদ্যানৈপুণ্যের সামান্য একটা পরিচয় মাত্র। ধ্রুবতারা বলে, ওর ভিতর দিয়ে চোর-কুঠুরীতে যাওয়া যায়, সেখানে ঠাকুরের গয়না লুকোনো থাকে। এখন কার কথা বিশ্বাস করি! ওঁদের সামান্য কথার গরমিলে আমার সন্দেহ বেড়ে ওঠে।

ভোগের পর শুতে গিয়ে মশা এবং ছারপোকার যুগল তাড়নায় টিঁকতে না পেরে নামের ঝুলিটা নিয়ে ঠাকুর ঘরের দাওয়ার পাশে এসে বস্‌লাম। রাত্তির একটু বেশীই হয়েছে। কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নাই। পাশে সমাজ

বাড়ীর 'দুই পহরী' থেমে গেছে। এমন সময় ঠাকুর দুয়োর খুলে আস্তে আস্তে ধ্রুবতারা বেরিয়ে এল। হাতে তার একটা কেরোসীনের টেমি, আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী উদ্গার করছিল। পর মুহূর্ত্তে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রভুপাদ। দুই জনে খানিকক্ষণ পরামর্শ চলল। স্বল্প আলোকে মুখের ভাব পষ্ট দেখতে না পারলেও দেখলাম যে অঙ্গচালনার সাথে সাথে প্রভুর টিকিটি থেকে থেকে খাড়া হয়ে উঠ্‌ছে। বুঝলাম প্রভু রেগে গেছেন। অন্য দিনের মত আজও মা-গোঁসাইর ঘরে নামলীলা চলছিল। প্রভুপাদ সেইদিকে একবার কটমট্ করে চেয়ে একেবারে তিন লাফে মা-গোঁসাইর বন্ধ দরজার সামনে হাজির হলেন। ধ্রুবতারাও পিছু নিল। ব্যাপার কি জানবার জন্যে আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। প্রভুপাদ আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, হুঁ, তুমি, আচ্ছা দাঁড়াও। তারপরেই বিরাট দাপটে মা-গোঁসাইর দরজায় দমাদম্ ঘা মার্‌তে লাগলেন। ভিতর থেকে মা-গোঁসাই জিগ্যেস করলেন, কে?

ধ্রুবতারা জবাব দিল, বাবা-গোঁসাই বলছেন, দরজাটা খুলে দেও।

তারপর সব চুপচাপ। মা-গোঁসাইর তরফ থেকে দরজা খুলবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। প্রভুপাদ অতিষ্ঠ হয়ে গর্জ্জাতে লাগলেন।

ধ্রুবতারা পুনরায় তাগিদ দিতে দরজা খুলল বটে কিন্তু সাম্‌নেরটা নয়। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাবা-গোঁসাই, ঐ পালালে!

প্রভুপাদ এবার ক্ষিপ্তের মত দরজার উপর আথাড়ি পাথাড়ি লাথি, চড় চালাতে লাগলেন। ফলে, একটু পর দরজা খুলে গেল। প্রভুপাদ ঝড়ের মত ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলাম কিন্তু মা-গোঁসাইর দিকে চেয়ে আর সাহসে কুলাল না। যায়গা-তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

প্রভুপাদ পাগলের মত এদিক ওদিকে কি যেন খুঁজে দরজার দিকে ফিরে এলেন। মা-গোঁসাই তাঁর সাম্‌নে তাঁর কঠিন মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে বেশ সংযত অথচ রুক্ষ-স্বরে, নিজের চরকায় তেল দিয়ে, পরে অন্যেরটা ভেজাতে এসো, বলে এক রকম জোর করেই তাঁকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, প্রভু, এ সব কি!

* * * * *

ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন প্রভুপাদের গুরুদেব দেহরক্ষা করেন। প্রতি বৎসর ঐ দিনে প্রভুর আঙ্গিনায় অষ্ট প্রহরী নামকীর্ত্তন ও মহোৎসব হয়ে থাকে। এবারও ব্যতিক্রম হল না। সকাল হতেই নেড়ানেড়ীর দল খোল, করতাল, পোঁটলা, পুটলি নিয়ে এসে হাজির হল। প্রভু-পাদ ঘুরে ঘুরে তাদের আদর আপ্যায়ন করছিলেন। বাবাজীরা এসে প্রথমে বসে গেলেন বাল্যসেবায়। উপ-করণ বিশেষ কিছুই নয়, মাত্র চিড়ে, সাদা খই আর ঝোলা গুড়। তাতেই বাবাজীরা মহা সন্তুষ্ট। চিড়ে পাতে পড়লে পংক্তির মাঝখান থেকে সর্দ্দার-বাবাজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জিকির দিলেন:—

প্রেম কহ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত
মহাপ্রভুজী কি জয়!

অন্যান্য বাবাজীরা শেষেরটুকু টেনে গাইলেন,—জয়!
সর্দ্দার-বাবাজী গাইলেন,—

ভাল খেলাম অম্বল খেলাম আরো খেলাম ভাজি।
আরে বিন্দাবনে যাবি যদি মন কর্‌গে রাজি॥
হরে হরে ভিঃ, নিতাই অবধৌত, জয় রাধারাণী
কি জয়!

অন্যান্য বাবাজীরা গাইলেন,—জয়!

বাল্যসেবার পালা শেষ করে বাবাজীরা তিন চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল কীর্ত্তন চালাবে আর এক দল সেই অবসরে বিশ্রাম নেবে। এইভাবে অষ্টপ্রহর অর্থাৎ আজ যে সময় আরম্ভ হল, কাল এই সময় পর্য্যন্ত সমানে নাম চলবে।

ঠাকুরঘরের আজ কোন সাড়া নাই, সকাল থেকেই তালা পড়েছে। ধ্রুবতারা, মা-গোঁসাই, এমন কি চৈতন্য-দাস বাবাজী পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত। প্রভুপাদ হুঁকো হাতে ঘুরে ঘুরে তামাক সেবা করে বেড়াচ্ছেন আর বাবাজীদের

কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করছেন। হঠাৎ একটি নবাগত দলের 'পর তাঁর চোখ পড়ল। অনেকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দলের ভিতর থেকে নধরকান্তি এক বাবাজীকে এক রকম হাত ধ'রে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাবাজী ত অবাক্! প্রভুপাদ জিগ্যেস করলেন, তুমি কোন্ আখড়ার হে?

আজ্ঞে, রাজারামপুর আখড়ার।

রাজারামপুর আখড়ার!, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক?

আমার গোঁসাই গৌড়ীয়।

চুল, দাড়ি রেখেছ কেন?

বাবাজীর চক্ষু ত চড়ক গাছ। অনেকক্ষণ আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলেন,—আজ্ঞে, মানৎ আছে।

কোন্ দেবতার কাছে?

আজ্ঞে, মা শেতলার কাছে।

প্রভুপাদ ভেংচি মেরে উঠলেন, মা শেতলার কাছে! ওদিকে বাবাজীর পেটের মধ্যে পীলে, লিবারে ঠোকাঠুকি খাচ্ছিল।

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে প্রভু বললেন,—বাবাজী, শাস্তরে কি বলে জান? বলে—

কেষ্টোধন ত্যাগ ক'রে যে অন্ত দেবে ভজে,
নিজ মাতা ত্যাগ করে সে চণ্ডালীতে মজে।

তুমি নিজের মাকে ত্যাগ করেছ। তুমি বোষ্টম সমাজের এঁটোপাতা। তোমার হাতের জল দিয়ে ইয়েও করতে নেই।

প্রভুপাদ আর বলতে পারলেন না। রাগে তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগলো। বাবাজী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ নীচু ক'রে বসে পড়লেন। কিন্তু তাতেই নিস্তার পেলেন না। একটু পরে নরসুন্দর এসে এক রকম জবরদস্তি করে তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত তৈল-চিক্কণ চুল দাড়িগুলি ফেলে, মাথায়, মুখে পাকা ধানের রং ফলিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাবাজী তিন পয়সার বাজার করতে এসে ছয় আনার গামছা হারালেন।

সমস্ত দিন একভাবে কীর্ত্তন চলতে লাগলো। সন্ধ্যের মহড়ায় ধ্রুবতারা এসে প্রভুপাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কি যেন বলে গেল। প্রভু যখন ফিরে এলেন, তখন আর তাঁকে চেনাই যায় না। মুখের জলন্ত ফূর্ত্তি পলকে নিবে ছাই হয়ে গেছে। রাত্তির বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীরা নামানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রভুর আর সাড়াশব্দ নাই। তিনি হাঁটুর ভিতর মাথা দিয়ে নিঃসাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু এভাবেও যেন সময় কাটতে চায় না। কি যেন একটা পরম দুশ্চিন্তা তাঁকে ভিতরে ভিতরে বিদ্ধ করে মারছিল। শেষে কোন্ ফাঁকে যে তিনি অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেলেন, তা আর জানাও গেল না।

বাবাজীদের কাছে ঘেসে হাঁটুতে তাল ঠুকে তাঁদের দোহারি করছিলাম। এমন সময় পিছন থেকে টোকা মেরে প্রভুপাদ ডাকলেন। উঠে গেলাম। প্রভু বললেন, তাই ত, বাবা, বোষ্টমদাস, তোমাকে ত আমার সাথে একটু না গেলে হয় না।

প্রভুর কণ্ঠস্বর বড় করুণ, চোখ দুটো মিনতিভরা। তিনি বলে যেতে লাগলেন, ওপারের রাধারমণকে ত জান। সে আমাকে স্মরণ করেছে, এক্ষুনি যেতে হবে।

এমন বেখাপ্পা সময়ে প্রভুর এ শিষ্যপুঙ্গবের উৎকট গুরুভক্তিতে একটু না চটে পারলাম না। কিন্তু হলে কি হবে, আপত্তি করবার জো নাই, আমি যে প্রভুর গরুড়। সুবোধ বালকের মত পিছু নিলাম। প্রভুপাদ তাঁর টিনের নৌকোখানি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বোঠে হাতে আগে আগে চললেন। আঙিনা পেরিয়ে আ-সারের ভিতরে পড়তেই ধ্রুবতারা এসে প্রভুর হাতে কি যেন একটা দিয়ে গেল। প্রভু তাড়াতাড়ি সেটা বগলের তলে নামাবলীর আড়ালে ঢাকা দিলেন।

ভাদ্রের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। রাত্রি নিঝুম, কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নাই। আস্তে আস্তে নৌকাটা নামিয়ে উঠে বসলাম। প্রভুপাদ তাঁর অপ্রীতিকর বোঝাটা নিয়ে অতি সন্তর্পণে আগা নৌকায় উঠে পড়ে রাধে গোবিন্দ স্মরণ করলেন।

নৌকো চল্‌তে লাগল। সন্ধ্যে থেকে যে দুষ্ট গ্রহটা প্রভুর ঘাড়ে চেপেছিল, সেটা নামে নাই। তিনি মাঝে মাঝে উস্‌খুস্‌ করে সভয়ে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। আমি তখন নামানন্দে মত্ত, প্রভুর দিকে বড় খেয়াল ছিল না। কীর্ত্তনের ধুয়োটা মনে মনে মহলা দিয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় জলে ঝুপ্‌ করে একটা শব্দ হোল। এক খণ্ড পাত্‌লা মেঘ সরে যাওয়াতে এক ঝিলিক জ্যোৎস্না এসে যে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে উন্মোচন করে দিল তাতে সতর্ক না হ'লে বোঠেটাই বোধ হয় হাত থেকে পড়ে যেতো। জলে পড়ে পুঁটুলিটার কাপড়টা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একখানি কচি মুখ! আর ঠিক্‌ থাকতে পার্‌লাম না। প্রভুর প্রভু-লীলা সাঙ্গ করে দেবার জন্যে বোঠেটা উঁচুতেই তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, বাবা বোষ্টমদাস, গুরু হত্যে করিস্‌ নি। কিন্তু আমার চেহারায় বোধ করি গুরু ভক্তির কোন লক্ষণই আর বর্ত্তমান ছিল না। নিমেষ মাত্র অপেক্ষা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নৌকাটা টাল খেয়ে তিন চার হাত পিছিয়ে গেল।

শিশুটিকে বুকে করে যখন আমি সাঁতরাচ্ছি প্রভু তখন কূল ধর ধর করে নিয়েছেন।

রাত্রি

শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

[ইংরাজী হইতে অনুবাদ—শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়]

এখনও তীরে লগ্ন ছায়া একাকিনী,
অস্ত সূর্য্য সিন্ধু-গর্ভে ডুবিছে নীরবে,
মুদিত-আলোক এবে দিবা হেমাঙ্গিনী।
বিস্তীর্ণ করেছে সন্ধ্যা স্বীয় ম্লানাঞ্চল
আকাশের চারিদিকে; গিরিশির হ'তে
সর্ব্ব-শেষ স্বর্ণ-রেখা নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল
গিয়াছে মিলায়ে;—নীলাকাশ স্বপ্নাবিষ্ট,
বিহ্বল নির্ব্বাক্‌, মাতৃত্ববেদনাতুরা;—
সুবর্ণরজত-তারা হবে যে প্রসূত!

তান্ত্রিকের গান

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নহ নহ নহ তুমি বর্ত্তুলবাসিনী
হে সুর-সঙ্গিনী তব অনন্ত আলয়,
এ মহীতে একা তুমি মুক্তি-প্রদায়িনী,
সুরাসুরে তব মাঝে করে হিয়া লয়।
কলকলায়িত এই বিশ্বের হিয়ায়
স্পন্দিত হতেছে সদা তোমার স্পন্দন
ছলছলায়িত সিন্ধুবুকে উথলায়
তোমারি অদম্যগীতি অনন্ত স্বপন।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ বিশ্বের তব বিন্দুকণা
লুকায়ে রেখেছ তাই নহে বিশ্ব দীন,
বিহঙ্গম-হৃদিতলে তোমারি মূর্চ্ছনা
তাই তারা কাননেতে নহে উদাসীন।
পুষ্প গুটিকার হৃদে তব বিন্দুধারা
উষার উদয়ে তাই হাসি ওঠে তারা।

(২)

হে সুন্দরি হাস্য তব দুখ লেশহীন
হাস্যে তব প্রস্ফুটিত জীবন-কমল,
তোমার কাহিনী সবি দিগন্তে বিলীন,
স্পর্শে তার খসি' পড়ে ধরার শৃঙ্খল।
তোমারি সিঞ্চন লভি' নন্দন-কাননে
ফুটি উঠে থরে থরে লক্ষ পারিজাত
তব স্রোতে অবগাহি যত সুরগণে
অজর অমর লভি যৌবনের পাত।
তোমাতে সিনান করি সুরসভাতলে
পুলকে আকুল নাচে মেনকা উর্ব্বশী
মুক্তবেণী নগ্নদেহা ; মর্ত্ত্য মহীতলে
তারি তলে ফাটি পড়ে আলোক উচ্ছ্বসি'—
মানব হিয়ায় যবে তব বিন্দু লীন
খুলি' যায় স্বর্গপথ, ব্রহ্মাণ্ড অসীম।

(৩)

ঢাল তবে ঢাল সখি মানসী আমার
ঢাল মধু পান করি ঢাল পুনরায়,
জীবনে মুছিয়া লক্ষ দীনতা সম্ভার
বহি যাক্ ওজধারা শিরায় শিরায়।
ফুটি যাক্ হৃদিতলে জীবন-কমল
বিচ্ছুরিয়া দিগন্তেতে অতুল সৌরভ,
বিকশিত হোক্ রক্ত নগ্ন শতদল
মিলাইয়া রিক্ততায় অনন্ত বিভব।
নাচুক নাচুক বক্ষে মেনকা উর্ব্বশী
ফুটাইয়া মর্ম্মতলে লক্ষ পারিজাত
মুক্তবেণী নগ্নদেহা, কোটী বাকা শশী
উজল করুক খিন্ন জীবনের পাত ;—
হাস্যে হাস্যে নৃত্য গানে উছল চঞ্চল
হে রঙ্গিণী তব রঙ্গে মর্ত্ত্য মহীতল!

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাতাসী

যার যা খুসি, সে তাই-বলে' ডাকে—শ্যাম্‌লী, ডব্‌কা ;—কেউ কেউ বা, আখ্‌খুটে।

ওর নব নব রূপ। কেউই মিথ্যে বলে না। যখন গা মেলে দিয়ে জিরোয়, সাঁঝের হাওয়া বয়, ও-পারের খেজুর গাছের আড়ালে দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে, ওকে শ্যাম্‌লী বল্‌লে বেমানান হয় না মোটেই। মাঝে মাঝে ভর্‌-দুপুরে জোয়ার আসে, ও তখন যেন কৈশোর পেরিয়েছে মনে হয়—ওর সর্ব্বাঙ্গ তখন উৎসুক লুব্ধ হয়ে ওঠে! তার পর ঝড়ের রাতে মা-হারা দুষ্টু খুকীর মতো সে কী গোঙানি, যেন মাথা কুট্‌ছে।

নদীটি রঙ্গিণী।

ও-পারে ভাঙন ধরেছে ; এ-পারে মাঠ, ওই বহুদূরের আকাশ ছুঁতে দৌড়ে ছুটেছে যেন।—বিস্তীর্ণ, বিশাল! কলাগাছের ঝোপে ঝোপে পাতার কুঁড়ে, মাঝে মাঝে মাদারের পাহারা। দূরের বেঁটে বটগাছটা মাঠের মধ্যিখানে সাক্ষীগোপালের মতো। সমস্ত মাঠটার কোলভরা ক্ষেত আনাজ-তরকারীর, যখন যা ফসল ধরে তা-ই ;—কফি মটর আলু মুলো,—কাঁচালঙ্কা ধনেপাতা পর্য্যন্ত। মাটির সবুজ ছেলে পিলে সব।

ও পারের মাটি-ভেঙে-পড়ার আওয়াজ এ পার থেকে শোনা যায়। শোনা যায় জলের নাচের নূপুর!

মাটি নিড়োতে নিড়োতে মোড়ল বলে—যাক্ রসাতলে ও-পারের বস্তি, এ-পার আমার শ্রীমন্ত হয়ে উঠুক!

ও-পারে পাটের কার্‌খানা। সারা দিন ধোঁয়া ছাড়ে। ও-পারের আকাশটুকুর মুখ গোম্‌রা, যেন মনে সুখ নেই। এ পারের আকাশ একেবারে মাটির বুকের কাছে নেমে এসেছে মিতালি পাতাতে, চোখে ওর বন্ধুতার হাসি মাখা,—দেখন্‌হাসি।

আলুর চারাগুলি সবে মাথা চাড়া দিয়েছে—ক'ড়ে আঙুলের মতো। ডগাটি দুলিয়ে দুলিয়ে আকাশকে ডাকে।

আরেক চাপ মাটি পড়ে। মোড়ল বলে—যাক্ লোপাট্ হয়ে। যত জোচ্চুরি-করা পয়সা। দড়ি দিয়ে কড়ি-

বাঁধা হুঁকোটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে—আমার এই বিশ বিঘে জমির ওপর মা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো পড়ুক, এই মাটি নিংড়েই সমস্ত গাঁয়ের মুখে ভাত দেব।

ধানের শীস্‌গুলি হেলে দুলে যেন সায় দেয়।

আরো বলে—জমির আরো বন্দোবস্ত নেব, শুধু রাঙা আলু নয়, মাটির কৌটো থেকে সোনা বেরুবে,—সোনা।

বলে' চোখ বোঁজে। স্বপ্ন দেখে হয় ত—পাকা ধানের স্বপ্ন!

এই ফাঁকা মাঠটায় খালি নুলোটাকেই বেখাপ্পা লাগে। ওর বাঁ অঙ্গ যেন আকাশকে ব্যঙ্গ করছে। ও বলে, কোন্ মারাত্মক জরে ওর দেহের আধখানা কাবু হয়ে পড়েছে। নইলে,—বাকী ইঙ্গিতটুকু ওর ডান দিকের অংশটা বেশ জোর করেই জাহির করে। সে দিকটা যেমন টন্‌কো তেম্‌নি জোয়ান্,- মাংস তো নয় লোহা, টিপ্‌লে আঙুলেই টোপ্ পড়ে। তার জন্যেই ও এই ক্ষেত নদী আকাশ মাঠকে বেশি করে' উপহাস করছে, মনে হয়। ওর দিকে চাইলেই ওর খোঁড়া পা আর নুলো হাতটাই চোখে পড়ে।

ওর বাপ কিন্তু বলে উল্টো কথা। জন্ম থেকেই নাকি বাঁ দিকটা বরাবর অসাড়—মোড়ল বলে। ওর মা'র দোষেই নাকি। ওর মা মরেছে,. তাতে খালি মোড়লেরই হাড় জুড়োয় নি,—তার অনাগত বংশধরদেরও। আরো বলে, ওটাকে মানায় ঐ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলির মধ্যে, ঐ কারখানায়—ওর ঐ থেঁৎলান হাত-পা দুটোকে।

বাপ ছেলেকে দেখ্‌তে পারে না।

খুব সকালবেলা জাহাজ আসে। সামনে একটা ইষ্টিশান,—এখান দিয়ে যাবার সময় ফুঁ দিয়ে যায়। আকাশের বুক যেন ব্যথা করে' ওঠে।

মোড়ল বলে—ওর ফুঁ,—তক্ষুনি ঘুম ভাঙা চাই। মাঠে যাবার ডাক। ভালোই হ'ল।

জাহাজটার ডাকের নড়চড় হয় না। যেন অভ্যেস হয়ে গেছে।

আপত্তি করে খালি ভূষণের বৌ। ভূষণকে উঠ্‌তে দিতে চায় না, কাঠটার ওপর চেপে ধরে' রাখ্‌বার চেষ্টা করে' বলে—ভোরবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় কৈ গা'টা একটু জিরোবে, না জন্ খাটুতে যাওয়া,—এখুনি। এ কি আব্দার!

ভূষণ বলে—মোড়লের হুকুম। মজুর খাটুতে এসে ভোরবেলায় বালিস পোষায় না। তুই আর একটু গড়া' না হয়।

উঠে পড়ে,—জোর ক'রেই। বৌ বড় ছেলেটাকে একটা থাব্‌ড়া মারে, ছোটটাকে লাথি। দুটো চেঁচাতে থাকে কাকের মতো। আরেকটা কান্নার শব্দ শোনা যায়। কেউ কেউ প্রশ্ন করে ভূষণের তৃতীয় শিশু কবে জন্মাল ফের? উঁকি মেরে দেখি, বৌটার নাক ডাকৃছে।

মোড়ল বলে—বেগুনের চাঙারিটা তুইই নে, কাঁচা। তুই কোন্‌টে নিবি বাতাসী? পুঁইশাকের ঝুড়িটা?

বাতাসী হেসে বলে—আমার মাথাটা কি এতই পট্‌কা যে মচ্‌কে যাবে? আমার মাথায় একটা বিড়ে পর্য্যন্ত লাগে না—খোঁপাই আমার বিড়ে। ঝিঙে কাঁকুড়ের ঝুড়ি আমার।

দেড় ক্রোশ দূরে সহরতলির বাজার। বালির রাস্তা ধু ধু করে। এক দমকে পার হয়ে যাই।

নুলোটা বাড়ীতে থাকে, এক হাতে বেত চাঁছে। বুড়ি কাঁথা সেলায়, চাল ঝাড়ে, শুক্‌নো পাতা গুছিয়ে জ্বালানি করে। আর সময়ে অসময়ে আমাদের মাথা কোলের ওপর টেনে নিয়ে উকুন বাছ্‌তে চায়। ঠিক মা'র মতো কিন্তু নয়।

বাতাসীকে বলে—এক-গা বয়েস হোল, বলি চল্ সহরে, একটা ঘর বেঁধে তোকে রেখে আসি। এখানে কি সোয়াদটা আছে বয়েস ভাঙিয়ে চড়া রোদে মাটি ম'লে?

বাতাসী ক্ষেপে ওঠে, বলে—তুই মর্ মাগী, তুই ত' মা ন'স্, রাক্ষুসী। বুড়ি হ'য়ে—বুড়ি বললেই বুড়ি পেঁচার মতো মরাকান্না সুরু করে। সে যে বুড়ি নয় তাই শুধু অস্বীকার করতে চায়। যৌবনের অনেক অপরিজ্ঞাত

রহস্যকথা উদ্‌ঘাটিত হয়,—এখনো তার কি কি যোগ্যতা আছে মেয়েকে তারও একটা ফিরিস্তি দিতে ভোলে না।

মেয়েকে শাপ দেয়।—তুইও একদিন বুড়ি হবি হারামজাদি। তোর দাঁত থাক্‌বে না, তবু নাল্ গড়াবে।

হপ্তায় দু'দিন করে' হাট বসে। সে দু'দিন গরুর গাড়ীটা বোঝাই হয়। মুলো হাঁকায়, পাচন চালাতে শিখেছে এক হাতে। হুঁকোটা খালি হস্তান্তরিত হতে থাকে। বাতাসী শেষ টান দিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রাখ্‌তে চায় মুছে। বলি—আমাকে দে, আর একটু খাই।

ওকে মুছ্‌তে দিই না। বাতাসী হুঁকো টান্‌ছে মনে হয় না, চুম্বন কর্‌ছে। মুখে লাগিয়ে আরো খানিকক্ষণ ফুঁক্‌তে থাকি।

ফির্‌তে ফির্‌তে প্রায় রাত হয়ে যায়। মাঝামাঝি পথে শ্মশান। চিতা জ্বল্‌ছিল। মুলোটা এক হাত তুলে নমস্কার কর্‌লে। দেখাদেখি বাতাসীও।

হেসে বল্লাম—দুগ্‌গো পূজো বুঝি ওখানে?

মুলো কিছুই বলে না। বাতাসী বল্লে—কালী পূজো। আগুনের জিভ্ মেলেছে। বাস্‌রে—

বল্লাম—শ্মশান থেকে মড়ার হাড় নিয়ে আস্‌ব, দেখ্‌বি বাতাসী?

ভূষণ বাধা দিতে চায়, মোড়ল বলে—যাক্ না, দেখি কেমন।

বাতাসী বল্লে—ঈঃ? মড়ার হাড়! আন্ ত' দেখি।

গাড়ীটা থেকে লাফিয়ে পড়্‌লাম। মুলো বল্লে—আর কিছু ছাই আনিস্ ভাই...

—ছাই? কি হবে? তোর ডালিম গাছটার সার্ কর্‌তে?

—মরা মানুষের ছাই—

শুধু ঐ টুকুন। আর কিছু ব্যাখ্যা করে' বল্‌তে পারে না।

দৌড়ে গাড়ীটা ধর্‌লাম। বেশি দুর এগোয় নি।

এই দেখ্, হাড় এনেছি বাতাসী। চোয়ালের। নিবি?

বাতাসী শিউরে উঠ্‌ল না না, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগ্‌ছে আমার—

মোড়ল বল্লে—ফেলে দে ওটা।

ফেলে দিলাম।

—ছাই আন্‌তিস ত' কপালে মাখ্‌তাম।

বাতাসীর কী ভয়! যেন দু'টি বুক ওর থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে।

বাতাসীর লেড়ি কুত্তাটাকে সবাই দুর্ দুর্ করে। বুড়ির ত' দু' চোখের ঝাল। বাতাসীর কাছে কিন্তু ও-ই সাত রাজার ধন এক মাণিক। ওর মুখটা বুকের ওপর নিয়ে বাতাসী ওর আঁটুল বাছে, সাবান দিয়ে নাওয়ায়, নিজের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ওর গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। মা'র খায় বেশি ভূষণের বৌর হাতে। বৌটার দিশে থাকে না, পোড়া কাঠটা দিয়েই মারে।

বাতাসীও তার প্রতিশোধ নেয় ভূষণের ছোট্‌টাকে থাব্‌ড়ার পর থাব্‌ড়া মেরে। মাঝে মাঝে মাদারের ডাল দিয়েও। বলে—বুঝুক, পরের ছেলেকে মার্‌লে কেমন লাগে—

ভূষণের বৌ তেড়ে এসে বলে—তাই হবে লো, পেটে কুত্তাই ধর্‌বি,—

বাতাসী জবাব দেয়না। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে পোড়া জায়গাটায় তেলপটি লাগায়। কুকুরটা জিভ্ বা'র ক'রে লেজ নাড়্‌তে থাকে।

নোংরা হলেও ওকে আদর কর্‌তে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। গায়ে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিই। রাতে নদীর গর্জ্জন শুনে ও যখন চেঁচাতে থাকে, ওর ঘেউ ঘেউ শুন্‌তে খুব ভালো লাগে আমার। নদীর যে ভাষার মানে আমরা এতদিন বুঝি নি, ও অ-বোলা কুকুরটা যেন তা বুঝে ফেলেছে। নদীর আর কুকুরের নিভৃত আলাপ শুন্‌বার আশায় কান পেতে থাকি।

বটের তলায় চ্যাটায়ে শুই। মুলো বলে—দাওয়ায় উঠে আয়।

বলি—ঠাণ্ডা সইবার মুরোদ আমার আছে। এক জ্বরেই বাত ধরে না গা'য়।

অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠি।

চার পাশে গা-ঢেলে-দেওয়া মাঠের মধ্যিখানে শুয়ে মনে হয়, সমস্ত শূন্য মাটি অফুরন্ত কথায় ভরে' উঠেছে। মাঝে মাঝে অর্দ্ধস্ফুট, কভু বা নিঃশব্দ,—তাই মানুষের কাছে অর্থহীন! ধানের ক্ষেতের পোকা থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত এই কথার বেতার চলেছে।

আলুর ক্ষেত থেকে বেগুনের ক্ষেতে কথা চলে। পুঁইর লতা ঝিঙের লতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাওয়ায় ছু'লে ছুলে' কথা কয়।

কথা চলে মাটির সঙ্গে মেঘের।

ভোরবেলা গা মুড়ি দিয়ে উঠেই কুকুরটা গোয়ালঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু ঘেউ করে' গরুগুলোকে সম্ভাষণ জানায়। গরু ল্যাজ নাড়ে,—ও ওর কান ছুটো। গরু পা'টা একটু নাড়ে, ও পাশেই গুটি মেরে বসে। খানিক-বাদে উঠে আবার একটু ঘেউ ক'রে বিদায় জানিয়ে আসে।

যেন ছুই অচেনা দেশের রাখীবন্ধন!

এই খোলা আকাশের তলায় সব চেয়ে ভালো মানায় কিন্তু বাতাসীর যৌবন। মিতালি ওর বাতাসের সঙ্গে—সব সময়েই ছুষ্টুমি লেগে আছে। ছুটি হাত তুলে ও যখন ওর ভিজা কাপড়টা মেলে বেড়ার গায়ে গোঁজে, বাতাস ওকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে কিন্তু। মাঝে মাঝে বাতাসের বেয়াদবিকে শাসন পর্য্যন্ত করে না।

ও যেন পূর্ণতা। নদীটাকে কখনো কখনো বাতাসী বলেও ডাকা যায়।

বাজার থেকে ফির্‌বার সময় রোজ পোষ্টাফিসে গিয়ে শুধোই—বেলেপাড়ার মাঠের কোন চিঠি আছে—কাঁচার নামে?

কে চিঠি লিখ্‌বে? তবু—

পাগ্‌ড়ী মাথায় কাকে বেলেপাড়ার মাঠ ভেঙে আস্‌তে দেখা গেল—পিওন। মোড়লের নামে মণি-অর্ডার। কিছু কিছু মহাজনি কার্‌বার আছে ওর। আঙুলের ছাপ নয়—পিওনের কাছ থেকে টুক্‌রো পেন্‌শিলটা চেয়ে নিয়ে হিজিবিজি কি লিখ্‌লে। চেষ্টা কর্‌লে পড়া যায়।

মোড়ল বলে, কোন্ গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে নাকি খানিক পড়েছিল ও,—অনেক আগে। পড়্‌তে ভুলে গেলেও দস্তখৎটা মুখস্ত হয়েই আছে।—

আরেক দিন। এবারো মোড়ল এগিয়ে গেল। মণি-অর্ডার নয়, চিঠি—কাঁচার নামে।

বাতাসী বল্লে—বাঃ, সুন্দর ছাপ মারা তো, দেখি!—কার ঠেঙে পড়িয়ে নিবি?

—বাজারে কত বাবুই ত' আসে—

দাদাবাবুর চিঠি।—জাপান থেকে লেখা। লিখেছে,—কলেজ কেন ছেড়ে দিলি, মক্‌বুল। যা টাকা পাঠাতাম, তাতে কি চল্‌ত না? চাষবাসের মত্‌লোব মন্দ নয়, কিন্তু একটা ডিগ্রি অন্তত নিয়ে নে, তোকে আমি বিদেশ পাঠাব। কি রকম আবাদ হবে তখন, বুঝ্‌বি। টাকার ঝুলিটাও ভারী ঠেক্‌বে।

পরে আরো লিখেছে—এখান থেকে আমি ইউরোপে পাড়ি দেব মাস ছয়েকের মধ্যে। টাকার দরকার হলে লিখ্‌বি। ইচ্ছে ইচ্ছে করে' ব'য়ে যাস্‌ নি। কেমন আছিস্?

বটের একটা ডালের সঙ্গে মোড়লের বেতো টাট্টুটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঝিমোয় আর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়ায়।

ওর জীর্ণ পাঁজরের তলায় কত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত হয়ে আছে জান্‌তে ইচ্ছা করে। ওর সারা গায়ে ঘা, ঘাড়ের লোমগুলি সব খ'সে পড়েছে, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে—বাতাসে তা কান্নার মতো শোনায়।

শয়ন-ঘরে ও-ই আমার দোসর. কিন্তু কত অচেনা!

ওর দিকে চাইলে আর একটি ছবি মনে পড়ে—সেই শিক্ষয়িত্রী মেয়েটির বিষণ্ণ বিরস মুখ! সেই দাদাবাবুর হাতের ওপর হাত থোয়া, সেই কথা কইতে না পারার অকথিত কান্না!

চষা মাটির গন্ধ এসে লাগ্‌ছে,—আলুর খোসার। তারার অস্পষ্ট আলো ধানের শীসের ওপর এসে পড়েছে, বেগুনের পাতায়,—ঘোড়াটার ঘোলাটে ছুই চোখে।

দাদাবাবুকে একটি চিঠি লিখ্‌তে হবে। চাষবাসই করব এমন ইচ্ছাই পরম নয়,— নাও করতে পারি। নানান্ ভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাই। একটা একটা করে' তার ছিঁড়ুক!

বটের কোটর থেকে কি একটা গায়ের ওপর ধুপ্ করে' পড়্‌ল— চেয়ে দেখি, সাপ। একেবারে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে ধারালো জিভ মেলে। ঘোড়াটার কাছ দিয়েও গেল না, ও যেন ওর বন্ধু,—যত ষড়্‌যন্ত্র ওর মানুষের বিরুদ্ধে।

পাশেই একটা ঢিল ছিল, ছুঁড়ে মার্‌লাম। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল না। সাপটা কাৎরাতে লাগ্‌ল। তারপর একটা ডাল ভেঙে নিতে কতক্ষণ?

মরা সাপটাকে মাপ্‌লাম—সাড়ে তিন হাত। গলায় জড়িয়ে নিলাম। মনে হল, বাতাসীর সে কী ভয় মরার হাড় দেখে,—ছুটি বুকের মন্থর কাঁপুনি।

বেগুনের ক্ষেতটা মাড়িয়ে যেতে পায়ে কাঁটা বিঁধ্‌ল। বিঁধুক্ গে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে—অন্ধকার হ'লেও বাতাসীকে চেনা গেল, আর অন্ধকার ব'লেই। বুড়ি মা পাশে শুয়ে। সাপটা বাতাসীর পায়ে জড়িয়ে দিলাম—আস্তে আস্তে।

ফিরে এসে,—ঘোড়াটার যে জায়গায় ঘা নেই বেছে নিয়ে চাপড় মেরে বল্লাম— এবার ঘুমো।

ও পেছনের পা ঠুকে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে— ঘুম আসে না। তারপর মুখ নীচু করে' ঘাস চিবোতে থাকে।

তুমুল চেঁচামিচি উঠ্‌ল—বুড়ির। কিছুই যেন জানি না, দৌড়ে গিয়ে শশব্যস্ত হয়ে বল্লাম—কি হ'ল, চোর?

—আমার বাতাসীকে সাপে কেটেছে রে! কি হ'ল রে?

ঘরে এসে দেখি, বাতাসী অজ্ঞান হয়ে গেছে ঘুমের মধ্যে। সাপটা টেনে খুলে ফেল্লাম। হুলো তারপর নির্ভয়ে বাতাসীর পায়ের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগ্‌ল।

রাত পোহাতে দেরি ছিল, কিন্তু বুড়ির চীৎকারে গাঁয়ের লোক বানের মতো ডাক দিয়ে এল। মোড়ল গরুর গাড়ী চড়ে' সহরে গিয়েছিল টাকা আদায় করতে। —সেই সকাল বেলায়ই।

তাই কর্তৃত্ব করে' বল্লাম কিচ্ছু ভয় নেই তোর, বুড়ি, সাপের বিষ আমি নামিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি,—দু'মিনিটে। কাঁচা-ওঝার কাছে মা-মনসার গাঁই-গুষ্টি সব ঠাণ্ডা নিঝ্‌ঝুম বুড়ি-মা। ওঠ্ ওঠ্ হুলো, পা ছাড়্! ওর মাথায় একটা ঠেলা দিলাম।

চোখের জলে ওর মুখটা কী বীভৎস দেখাচ্ছে। নীচের পুরু ঠোঁট্‌টা ঝুলে পড়েছে,—মুখখানা গেছে পাঁচিয়ে। একটা চড় মেরে মুখের কুঁচ্‌কানিগুলি টান ক'রে দিতে ইচ্ছা করে।

বুড়ি ওর চিম্‌টে বুকটার মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে' বল্লে—দে বাপ্, আমার বাতাসীর চোখ খুলে দে— পারিস্ ত' বাতাসী তোরই।

বল্লাম—এই, হুলোটা বুঝি চোখের জলে কাটার দাগটাই মুছে ফেলেছে—

—কি হবে তা হলে? বুড়ি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

হুলো অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে দু হাত দিয়ে বাতাসীর দুটি পা মুছ্‌তে মুছ্‌তে ডিবের অস্পষ্ট আলোয় কি একটা ছোট্ট পাঁচ্‌ড়ার দাগ বের কল্লে—দেখ্ ত' কাঁচা, এইটেই বুঝি —বলে' বুড়ো আঙুলের প্রকাণ্ড নখ্‌টা দিয়ে একটা আঁচড় দিলে। রক্তও একটু বেরোল।

একজন বল্লে—দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল ত' পা-টা?

বুড়ি হতাশ হয়ে আমার দিকে চাইল।

বল্লাম— বাঁধার দরকার হয় না।

— তা হলে বিষ এতক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ ছেয়েছে,—রক্ষে নেই।

— অত সস্তায় নয় পালের পো, পায়ের ওপর মন্তর পড়্‌তেই বিষ সেখানে জমাট্ বেঁধে গেছে। ঠোঁটের কাছে একটু কেটে দিলেই সব বিষ উপে যাবে। এ মন্তরে স্বয়ং মা-মনসাই ভির্ম্মি দিয়ে পড়্‌বেন।

বলে' বাতাসীর পায়ের কাছে মুখ এনে বিড়বিড়, করে, যা তা বল্লাম। কেউ কিছু বুঝ্‌ল না বলে'ই সেটা মন্ত্র ব'লে বিশ্বাস কর্‌ল।

ভূষণের বৌ পাশ থেকে ব'লে উঠ্‌ল— ঘোড়ার ডিমের মন্ত্র, যাবে সব ফেঁসে। দেমাকে মাটিতে পা পড়্‌ত না,— মনসা ত, ঘুমোয় না, প্রত্যক্ষ দেবতা।

বুড়ি ক্ষেপে গেল—মরুক মরুক তোর হাবা-টা, সারা জন্ম ভুগ্‌ছে,—হাড় জুড়োক। বাতাসীর পেটে হাবা জন্মাবে না লো—

—কুত্তা জন্মাবে। দেখ্‌, কে মরে। মর্‌লে পর ভোরবেলাই স' পাঁচপয়সার হরির লুট্‌ মানৎ রইল। সাক্ষী তোরা, তোদের সব্বারই নেমন্তন্ন। বলে' হুম্‌ হুম্‌ করে' চলে' গেল।

বল্লাম—তোর কিচ্ছু ঘাব্‌ড়াবার নেই, বাতাসী চোখ্‌ চাইল বলে'। অকারণে একটা দড়ি পাকাচ্ছিলাম। ঝুলোকে বল্লাম—যা ত জল নিয়ে আয় ভাঁড়ে করে'।

ঝুলো ছুটে জল নিয়ে এল।

—কোথেকে আন্‌লি? কল্‌সি থেকে,—বাসি জল? যা বোকা, নদীর থেকে নিয়ে আয়,—শিশির-ঠাণ্ডা জল।

ঝুলো ভাঁড় নিয়ে নদীর মুখে ছুট্‌ল।

জল নিয়ে এলে ফের হুকুম দিলাম—ছটো বেগুনের পাতা ছিঁড়ে আন্‌।

তাই আন্‌তে ছুট্‌ল। সে কী চলা! কোমড়ের সঙ্গে পায়ের আড়ি—কাঁধের সঙ্গে কনুয়ের। ইচ্ছে করে ল্যাং মেরে ফেলে দিই।

বেগুনের পাতাও এল।

পাতার আর দড়ি নিয়ে খানিকক্ষন ঝাড়-ফুঁক করে' ঠাণ্ডা জল খানিকটা ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলাম।

বল্‌লাম—এবার ঠোঁট্‌টা একটু কেটে দিলেই চোখ্‌ চাইবে।

অবশ্যি দাঁত দিয়েই—

নীচু হলাম। দংশন নয়,—দগ্ধ করে' দিতে চাই।

কচি মটরের খোসার মতো ছটি কালো ঠোঁট। ওর ওষ্ঠপুট নিবিড় চুম্বনে ডুবিয়ে দিলাম।

তারপর আর কয়েকবার জল ছিটোতেই চোখ খুল্‌ল বৈ কি।

জয়-জয়কার পড়ে' গেল। ঝুলো আমার হাতটা নেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না,—একেবারে পায়ের ধুলো নিলে। বুড়ি আবার বুকের ওপর জাপ্‌টে ধর্‌লে, কিন্তু ওর পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি কর্‌লে না।

বাতাসী অবাক হয়ে গেছে।

সকালবেলার ষ্টীমারের ফুঁ দিল।

ঘরের ছাঁইচে পিঁড়ের ওপর বসে' হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে মোড়ল বল্লে—তামাক ভরে' দেবে এমন একটি প্রাণী পর্য্যন্ত নেই।

ঝাঁকার থেকে চুঁচুল্‌ তুল্‌তে-তুল্‌তে বুড়ি বল্লে—এক-টিকে রাখ্‌লেই হয়!

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে, নিবন্ত কল্‌কেটা উপুড় করে' পিঁড়ের গায়ে ঠুক্‌তে-ঠুক্‌তে মোড়ল বল্লে—তোর বাতাসীকেই দে' না। বেশ ত' ডাগর হ'ল।

কোঁচড়ে চুঁচুল্‌গুলি রাখ্‌তে রাখ্‌তে বুড়ি বল্লে—তোর বয়েস কত হ'ল?

বুড়ির ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা।

মোড়ল নিজের বুকের ছাতির দিকে চাইল। বল্লে—ইয়া বুকের পাটা, এই দেখ্‌ হাতের থাবা, মাটি দলে' এই পায়ের গাঁথ্‌নি—বয়েস? বাতাসী তোর সুখে থাক্‌বে।

কোঁচড়টা বেঁধে বুড়ি মোড়লের কাছে বসে' একটা টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে লাগ্‌ল। নতুন করে' আর এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে চায়।

বল্লে—তোর এই বয়েসে বাতাসীর মাকে নিলেই মানায় ভালো। বলে' খিক্‌ খিক্‌ করে' হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মোড়ল বল্লে—খালি তামাক সাজ্‌তেই না কি রে?

হুঁকোটা মোড়লের মুখের কাছে তুলে ধরে' বুড়ি গম্ভীর হয়ে বল্লে—দেখিস্‌—

যেন ওর সারা গায়ে ভোলা' যৌবনের আমেজ এসে লাগ্‌ল।—ভাবখানা এম্‌নি কর্‌লে।

মোড়ল বুঝি বুড়ির প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে। বুড়ি উঠে চল্‌ল,—একটা টান দিয়ে যাবার প্রলোভন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে'।

বিড়্‌বিড়্‌ করে' বল্‌ছে—গালের হাড় ছটো ঠেলে বেরিয়েছে, চুল অকালেই পেকে গেল।—তা আমি কি করব? নইলে বাতাসী ত' সেদিন হ'ল—

মোড়লের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে বল্লাম—বাতাসী ত' আমার, বুড়ি-মা। সাপের থেকে কে বাঁচাল? কি বলেছিলে সেদিন?

বুড়ি মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্‌লে—মর্‌ ছুঁচো, চাল চুলো নেই, জন্মের ঠিক নেই,—বাতাসী?

পরে বলে—বাতাসীর সারা গায়ে হীরে-জহরৎ। তখন চাষার ছেলে? আপিসের বাবু,—কাতারে কাতারে।

বুড়ির কথায় রাগি না। বটগাছটার তলায় বসে' নিজের চওড়া বুকটা ফুলিয়ে চেয়ে থাকি। হাতের 'মাস্‌ল্' শক্ত ক'রে, টিপে টিপে দেখি। দেখি—

আশ্চর্য্য! নিজেকে বলে' নিজেকে চম্‌কে দিই।

চট্‌ করে' অমলের কথা মনে পড়ে' যায়। কলেজে সেদিন আমাকে ও বলেছিল—আশ্চর্য্য! দুঃখ যা লাগে তার চেয়ে আশ্চর্য্য বেশি লাগে, কাঞ্চন। যাকে সাত-সাত বছর ধরে' ভালোবাস্‌লাম, সে মাথায় সলজ্জ ঘোম্‌টা টেনে,—কথাটা শেষ কর্‌তে পারে না, বলে' ওঠে—আশ্চর্য্য!

যেন বিশ্বাস করতে চায় না। যেন নিজে নিজের ভূত দেখ্‌ছে।

বছর ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই যখন মা মারা গেল, শ্মশানে আমাকে বলেছিল—বুকের নাড়ীগুলো সব ছিঁড়ে গেছে ভাই। যেন পাথর হয়ে গেছে।

গঙ্গার এ-পারে মা'র চিতা জ্বলে, ও-পারের অন্ধকারের পানে মুখ করে' ফের বলে—আশ্চর্য্য। সব আশ্চর্য্য লাগে। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে মা'র ঐ দেহ, আকাশ-ভরা অন্ধকারের গলায় তারার এই পুষ্পমাল্য, অনন্ত জীবনে প্রিয়ার অনন্ত উদার বিরহ। আশ্চর্য্য না?

বি, এ ক্লাশের লাষ্ট্‌ বেঞ্চিতে বসে' ও আমাকে ওর প্রেমের গল্প বল্‌ত,—রোজ! বল্‌ত—হাত পাত্‌লেই যা পাওয়া যায় হাত উপুড় কর্‌লে তা কতক্ষণ?

আশ্চর্য্য।

চেয়ে দেখি, ডালিম গাছটার তলায় নুলো বসে', আর তার খুব কাছ ঘেঁসে বাতাসী।

এগিয়ে যাই। কোলের ওপর নুলোর খোঁড়া পা-টা তুলে নিয়ে বাতাসী তাতে কি খানিকটা মাখ্‌ছে।

কি কর্‌ছিস্‌ বাতাসী?

ওর পায়ে একটা তেল ম্যাখ্‌ছি। কব্‌রেজ ব'লে দিয়েছে, বাতের অব্যর্থ ওষুধ। এই টুকুন্‌ শিশি ভাই, দাম নিলে সাড়ে ন' আনা।

কোন্‌ কব্‌রেজ?

তেলিবাজারের অন্নদা কব্‌রেজ। সেই যে রে—

বুঝেছি।

বাতাসী সহরে গিয়ে নুলোর জন্য এই তেল কিনে এনেছে।

বল্লাম—মোড়ল বুঝি পয়সা দিয়েছিল?

বাতাসী হাতের তেলোয় আরো খানিকটা তেল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বল্‌লে—হ্যাঁ, মোড়ল দেবে? জানিস্‌, ওর এই খোঁড়া পা-টায় লাঠির বাড়ি মারে। বাপ ত না সুমুন্দি।

পরে নুলোকে বল্‌লে—তুই তোর এই জ্যাঁতা পা-টা ওর মুখের ওপর তুলে দিতে পারিস্‌ না?

তবে কোথায় পেলি?

বাতাসী হাস্‌ল, বল্‌লে—ট্যাঁড়স্‌-এর দর আজ চড়িয়ে দিয়েছি। মোড়লকে বলিস্‌ নি যেন।

কাছে মাটির ঢিবিটার ওপর বস্‌লাম।

আমার মুখে হাসি দেখে নুলো বল্‌লে—কিচ্ছু হবে না এতে।—তুই বাজে চেষ্টা কর্‌ছিস্‌।

বাতাসী ধমক দিয়ে বল্‌লে—না, হবে না? কালু-ধোপার বৌটার সেদিন কি বমি, নাড়ি ভুঁড়ি উল্‌টে' পড়্‌ল। অন্নদা কব্‌রেজ একটা বড়ি দাঁত দিয়ে কেটে আদ্ধেক খাইয়ে দিলে মাগীটাকে। বমিকে যেন যমে গিলে খেল। দেখিস্‌ না তোর পা দু' দিনেই কেমন টন্‌কো হয়ে উঠে। এই হাত দিয়েই মার্‌বি কুড়োল, এই পা দিয়েই তোর বাপের মুখে লাথি। বলে' জোরে জোরে মালিশ কর্‌তে লাগ্‌ল।

নুলোর চোখে ঘোর লেগেছে। ছোট্ট ডালিমগাছটার ডগায় একটা ছোট্ট ফুল ফুটেছে—তার দিকেই চেয়ে আছে। গাছটা ওর নিজের হাতে পোঁতা। দু'দিন পর পরই সন্ধ্যো

বেলা একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে মাপে—এ দুদিনে কত-টুকুন্ বড় হ'ল। গাছটা প্রথম যেদিন সরু কাঙাল দুটি ডা'ল আকাশের দিকে মেলে ধর্‌ল, হুলো আনন্দে গাছটার চার পাশে খোঁড়া পা-টা নিয়ে খুব নেচেছে। দুটি আঙ্‌লে অতি আলগোছে, যেন অতি কষ্টে, সবে-গজানো কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে,—যেন ওদের চোখে ব্যথা লেগে যাবে, এই ভয়। কত ডাগরটি তারপর হ'ল, কত পাতার ঘোম্‌টা টেনে দিল,—আজ বুঝি অরুণিমার আশীর্ব্বাদ লেগে এতদিনে ফুল ফুটেছে।

বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা হুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।

শুধোলাম—আরাম লাগ্‌ছে রে হুলো?

বাতাসী ধমক দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—একদিনে কি? দিন দু'-তিন্ যাক্।

মনে হয়, হুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জলতরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে! এখুনি যেন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' উঠ্‌বে।

তেলে-ভিজা হাত বাতাসীর!

মালিশ শেষ করে' বাতাসী হুলোর ওপরের-ঠোঁটের ওপর আঙ্‌ল বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। তাতে মৌমাছির কালো কচি পাখার মতো গোঁফের রেখা উঠেছে।

চলে' যাবার সময় বল্লাম—এই অসাধ্য সাধনা কেন কর্‌ছিস্ বাতাসী? মায়ের পেট থেকে যে তে-ব্যাকাই হয়ে জন্মাল, সে আর সিধে হয় না। যতই তেল মেখে হাত লাল কর্‌ না।

বাতাসী এমন ক'রে তাকাল, যেন ওর ধারালো নখ্ দিয়ে এখুনি এসে মুখের ওপর খাম্‌চি বসিয়ে দেবে।

বকের ঠ্যাংয়ের মতো কাহিল পা দু'টি ফেলে ফেলে ছুটতে ছুটতে হাবা এল।

ওর জ্বর ছেড়েছে। সারা বছরে এই একবার ওর জ্বর ছাড়ে। যখন প্রথম দখিনের হাওয়া দেয়।

ছেলেটা প্যাবায় ভোগে। রোগা বড় বড় চোখ দুটো পাঁশুটে। আকাশের দিকে চাইতেই খুসিতে উপ্‌ছে গেল। আকাশের সঙ্গে ওর যেন প্রথম আজ শুভদৃষ্টি।

ফাঁকা ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' তাকায় চার পাশে। সরু গলাটা ঘোরাতে থাকে। শালিখ ধর্‌তে হাত বাড়িয়ে ছোটে, রোগা পা নেতিয়ে আসে। শিশির-ভিজা কফির পাতায় পাংলা হাতখানি ধীরে ধীরে রাখে, বুলায়।

মোড়ল ক্ষেত থেকে কফি তুলে' ঝুড়ি ভরে। হাবা রোদে পিঠ দিয়ে পাশে এসে বসে। দু হাতে মাটি ছান্‌তে-ছান্‌তে বলে—এবারে কত কফি হল' মোড়ল-কাকা? সবাইর ঘরে যাবে ত' একটা করে! আমাকে একটা দাও—ফাউ। আজ জরটা ছাড়্‌ল। মাকে বল্‌ব কফি রাঁধ্‌তে। দু'টো হ'লে বেশি করে'—

মোড়ল ওর কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে—নাই বা রইল কেউ পাশে। বাঁ হাতটা কেটেই বা নিক্ না কেন। এই এক হাতেই লাঙল চষে' সোনা ফলাব।

—মোড়ল-কাকা, ধলি-গরুটা ক' সের দুধ দেয় এখন? ওর বাছুটার রং কি করে' লাল্‌চে হল? কেমন ঢুঁ দিচ্ছে দেখ! বাঃ, ফড়িং ধরব।

কফির পাতায় হলদে পাখা বুঁজে ফড়িং বসে। হাবা চুপ্‌সো আঙ্‌লগুলি বাড়ায়, ফড়িংটা একটু উড়ে গিয়ে সরে' বসে',—হাবা আর আঙ্‌ল বাড়ায় না। দেখে।

মোড়ল আপন মনে বলে—সোনার ক্ষেতের লক্ষ্মী হয়ে থাকৃত!—তা নয়! যাবে যখন লুঠ্ করে' লাঠিয়াল, বা খোলার ঘরে কাৎরাবে যখন ব্যামোয় পড়ে'! সেই বুঝি ভালো হবে? যাক্ আমার কি? আমি এই ক্ষেতে বুক দিয়ে পড়ে' থাক্‌ব।

হাবা আমার কাছে এসে বল্লে—আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দাও না, কাঁচা-দা! কোনোদিন ঘোড়ায় চড়ি নি আমি।

বল্লাম—ওর সারা পিঠে যে ঘা।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে—কৈ ঘা? ও কিছু না, দাও না চড়িয়ে।

একটা কলাপাতা ছিঁড়ে এনে ঘোড়ার পিঠে পেতে দিয়ে ওকে আস্তে আস্তে কোলে করে' তুলে দিলাম।

ঘোড়াটার দু' পাশে দু' পা ঝুলিয়ে দিয়ে ও এমন ভাবে বস্‌ল, যেন ও রাজা—সিংহাসনে বসেছে। নীল আকাশ যেন ওর রাজছত্র।

দড়ির লাগামটা একটু টেনে কঞ্চির মতো পা দুটি একটু দুলিয়ে ঘোড়াটাকে চালাতে চাইল জিভ্ দিয়ে শব্দ করে'। ঘোড়াটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে' হাঁট্‌তে লাগ্‌ল,—যেন হাঁট্‌তে পাচ্ছে না, ঘা গুলো টন্‌টন্ কর্‌ছে।

হাবা আর ঘোড়াটা যেন বন্ধু। দৌড়ে যাবার জন্য ঘোড়াকে একটুও খোঁচাচ্ছে না কিন্তু। ঘোড়াটাও আস্তে চলেছে। ওরা যেন পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ওকে কোলে করে' ফের নামিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠটা একটু চাব্‌ড়ালে। পরে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে রইল,—জেলে-নৌকোরা পাল তুলে দিচ্ছে।

ওর এই বাঁশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টল্‌মলে দেহটিকে কিন্তু খাপ্‌ছাড়া লাগে না। ও যেন মেঘ্‌লা-আকাশের বুক চেরা তৃতীয়ার চাঁদের এক টুক্‌রো ঘোলাটে মলিন হাসি।

বল্লে—কাঁচা-দা, নদীতে নাইতে যাব আজ।

—চড়ুই পাখীর ডাল্‌না খাওয়াবে,—রাঙা আলুর সঙ্গে?

—বুড়ির মাথায় মারব এই ঢিলটা?

—নদীর মধ্যে তিমি মাছ হয়ে নৌকোগুলি গিল্‌লে কেমন হয়?

শেষে হাত পেতে বল্লে—আজ আমার জ্বর ছাড়্‌ল, কিছু বক্‌শিস্ দাও না কাঁচা-দা'। বলে' হলদে দাঁতগুলি বের কর' হাস্‌তে লাগ্‌ল।

কোন্ পাড়া থেকে একটা ভেড়ার ছানা এ পাড়ায় চলে' এসেছে পথ ভুলে'।

চষা মাটির ওপর ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট দাগ।

বাতাসী ওর মুখটা চেপে ধরে' বল্লে—বা, বাঃ,—দেখ্ এসে দুলো, কেমন সুন্দর বাচ্চাটা।

হাবা দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—আমার কোলে একটু দাও না বাতাসী-দিদি!

সমস্তটা দিন বাতাসী ভেড়াটাকে বুকে বুকে রাখ্‌লে। ওকে আর কুকুরটাকে একসঙ্গে নাওয়ালে,—চেনা করিয়ে দিলে। কুকুরটা জিভ্ বার' করে' ভেড়ার পা-টা একটু চাট্‌ল।

বিকেল বেলা দু' হাঁটু ধূলো নিয়ে ও-পাড়ার দুলাল এসে হাজির। বল্লে—পথ ভুলে হেতায় পালিয়ে এসেছে বুঝি? আমি সারা সহর তন্ন তন্ন—

বল্লাম—তুই না এসে পড়্‌লে রাত্রে বাতাসী আমাদের মাংস রেঁধে খাওয়াত। দেরি করে' এলে নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে পার্‌তিস্।

বাতাসী রুখে উঠ্‌ল—কক্ষণো না। মিথ্যে বল্‌ছিস কেন? ওর গায়ে কে বঁটি তুল্‌বে?—ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বল্লে—দুষ্টুমি করো না। বাড়িতে থেকো,—মাঠে।

ভেড়াটা চলে' গেলে কুকুরটাকে কোলে টেনে নিয়ে আঁটুল বাছ্‌তে বসল।

হাট বার। মোড়ল দু' দিন বাড়ি ফেরে নি। ভূষণেরও কাল রাতে জ্বর হয়েছে।

বল্‌লাম—মোড়ল বৌ আন্‌তে গেছে বুঝি!

বুড়ি ধনেশাক তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—দেখি না কেমন বৌ আনে। চল্লিশ বছর ছাড়া কে রাজী হয় দেখি!

এ দু'দিন দুলোকে বাতাসীই রেঁধে দিয়েছে। খাইয়েও দিয়েছে এক আধ গরস।

আমি যদি বলি—আমাকে আর রাঁধাস্ কেন? ঐ সঙ্গেই আর দু' মুঠ্ চাল নে' না! বাতাসী কঠিন হয়ে বলে—তোর সোমত্থ দুটো হাতের ত' কত বড়াই করিস্? এক হাতে কাঠ ঠেল্‌বি, আর হাতে হাতা দিয়ে ভাত নাড়্‌বি।

বল্‌তাম—কিন্তু ও কি ভাত মাখ্‌তেও পারে না?

বাতাসী ক্ষেপে উঠ্‌ত। বল্‌ত—না। খাইয়ে দিলে খেতে জানে।

আমি খাইয়ে দিই তবে?

দে না। আঙুলে ঘ্যাচ্‌ করে' কাম্‌ড়ে দেবে। বলে' কাঁধ দুটো দুলিয়ে হেসে উঠ্‌ত!

গরুর গাড়ীটা বোঝাই কর্‌ছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। বল্লাম—আজ শশার ঝুড়িটায় খুব হাঁক দেওয়া যাবে, কি বলিস্‌ বাতাসী? হাবা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে—আমিও হাটে যাব কাঁচা-দা।

—চল্‌।

হুলোই গাড়ী হাঁকায়। যত বলি,—বাতাসী, একটা কথা শোন্‌, ও শুধু ঘাড়টা একটু কাৎ করে' বলে,—বল্‌। একটুও সরে' আসে না।

অগত্যা হাবার সঙ্গেই গল্প করি।

—গাঙ্‌শালিকের ঝাঁক চলেছে।

—কাঁথার তলায় আর শুতে হবেনা, ভারি মজা!

—আলু তুমি মেপে দেবে আর আমি গুণে গুণে পয়সা থাক্‌ করে' সাজাব! কেমন?

বাতাসী যে একেবারে শুয়ে পড়্‌ল।

শুয়ে শুয়ে বাতাসী বল্‌ছে হুলোকে—রাতে এক্‌লা শুতে কাল তোর খুব ভয় কর্‌ছিল, না?

হুলো বল্লে—কাঁচাকে আজ শুতে বল্‌ব'খন্‌।

—দূর! ও সাপুড়ে,—

হাট থেকে ফির্‌বার মুখে বল্লাম—তোরা একটু খানি গাড়ীটা নিয়ে দাঁড়া। আমি হাবাকে একটু সহর দেখিয়ে আন্‌ছি।

হাবা যা দেখে তাই অবাক হয়ে দেখে। বলে—খাবারের দোকান! কত বোল্‌তা ঘুর্‌ছে চারপাশে? আচ্ছা, ময়রাদের ক্ষিদে পায় না কাঁচা-দা?

—পায় বৈ কি। দোকানে ঢুকলাম।

পরে একটা দর্জ্জির দোকানে। বল্লাম—এর একটা কোটের মাপ নিন্‌ ত।

হাবা আনন্দে তার গা থেকে ছেঁড়া চিট্‌চিটে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেল্লে। এক, দুই, তিন—আট,—পাঁজর গোণা যায়। ষোলো ইঞ্চি ছাতি।

দোকানের সুমুখে কতগুলি মেথরের ছেলের ভিড় জমে' গেছে! হাবা ওদের দিকে এমন করে' চাইছে,—ওরা যেন ভিক্ষুক।

—কবে কোট্‌টা হবে কাঁচা-দা?

—দু' তিন দিনের মধ্যে।

হাত তালি দিয়ে বলে' ওঠে—মা'কে জান্‌তেই দেব না। কাপড়টা গায়ে দিয়ে থাক্‌ব। হটাৎ কাপড়টা খুলে নিলেই জামাটা দেখে ও চম্‌কে যাবে।

গোলাপফুল-তোলা ছিট্‌। সব বেছে ওটাই ওর পছন্দ। বলে—কোট্‌টায় ক'টা ফুল পড়বে? গোটা কুড়ি নিশ্চয়ই।

পরে বলে—গাবার জন্য একটা ঝুম্‌ঝুমি কেন' না কাঁচা-দা।

গাবা ওর ছোট ভাই।

রাস্তার পাড়ে একটা আম গাছ,—কচি আম ধরেছে। বল্লে—আমাকে দুটো আম পেড়ে দাও না!

বল্লাম—টক আম খেলে ফের জর হবে।

—এম্‌নি না খেলেও হবে। আমার তো মোটে এ ক'টা দিন ছুটি। পরে ত' ফের কাঁথার তলায় শোবই। দাও না!

উঠ্‌লাম। নাম্‌বার সময় পা পিছলে পড়ে' গেলাম মাটিতে। হাঁটুটা যেন একটু মচ্‌কে গেল। এসে দেখি, ফাঁকা রাস্তা—গাড়ী নেই। ওরা এক্‌লা এক্‌লা চলে' গেছে।

হাবা—কি হবে তবে?

—হেঁটেই যেতে হবে।

খোঁড়াচ্ছিলাম। হাবাও আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। তখন অন্ধকার তার ডানা মেলেছে।

হাবা হাঁপ নিয়ে বল্লে—ঘোড়াটা থাক্‌লেও বেশ হ'ত।

তুমি হাঁকাতে, আর আমি তোমার পিঠ আঁক্‌ড়ে বসে' থাক্‌তাম্।

বল্লাম—তুই আমার কাঁধে চড়্।

তোমার পায়ে যে লাগ্‌বে।

লাগুক্। কাঁধে তুলে নিলাম।

আমার চুলগুলো দু' হাতের আঙুল দিয়ে টেনে ধরে' হাবা বল্লে—ওখানে অত আগুন কিসের কাঁচা-দা?

মরা পুড়্‌ছে। যাবি?

চল না। একটু জিরিয়ে নেবে।

শ্মশানে এসে নদীর ধারটায় একটু বস্‌লাম।

হাবা বল্লে—আমার ভারি ভয় কর্‌ছে কাঁচা-দা।

কেন?

ঐ তালগাছটার ওপরে কে? দুই লম্বা ঠ্যাং মেলে? এখান থেকে চল,—চল।

কোথায় লম্বা ঠ্যাং? ছাৎ।

না, না,—প্রকাণ্ড হাঁ-টা, লাল চোখ্। চল কাঁচা-দা। শীগ্‌গির। এই দিকেই যে আস্‌ছে।

কাঁধের ওপর তুলে নিলাম ফের। আমার চুলগুলি ভীষণ জোরে টেনে রইল।

বলে—আর কদ্দূর।

বাতাসীকে গিয়ে বল্লাম—গাছ থেকে নাম্‌তে গিয়ে হাঁটুটা মচ্‌কে গেল, বাতাসী। তোর তেলটা দে না একটু মালিশ করে'।

বাতাসী বল্লে—মচ্‌কেছে ত' নিশুন্দি পাতা বেঁধে রাখ্‌না। ও তো বাতের তেল।

তবু দে না একটু মালিশ করে'। সেরেও যেতে পারে শীগ্‌গির।

কক্ষনো সার্‌বে না এতে।

একবার মেখেই দেখ্ না। একদিনেই কি আর ফল হয়?

বাতাসী আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে—তেল আর নেইও। ফুরিয়ে গেছে।

সাড়ে ন' আনা পয়সা দিলে কাল কিনে এনে মেখে দিবি?

বাতাসী ক্ষেপে উঠ্‌ল।—কেন, তুই কিনে আন্‌তে পারিস্ না? তোর হাত দুটো এমন কি অথর্ব হয়েছে যে একেবারে চাক্‌রাণী চাই তেল মেখে দিতে?

চাক্‌রাণী কেন?—ঐ যে কোণে ইটের পাঁজার কাছে শিশিটা, ঐ ত' আছে খানিকটা তেল।

এগিয়ে আস্‌তে দেখে বাতাসী তাড়াতাড়ি শিশিটা দু'মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে' চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—যা যাঃ, পালা! অল্প একটুখানি মাত্র আছে। কাল ভোরে ওকে মেখে দিতে হবে না?

চলে গেলাম।

বাতাসী বল্লে—বেশ হয়েছে। খুব খুসি হয়েছি। আর ক্ষ্যাপাবি খোঁড়া বলে'?

মোড়ল ফিরে এসেছে—বৌ নিয়ে নয়, কতগুলি টাকা নিয়ে।

আমাদের মাইনে দিলে। হুলোকে পর্য্যন্ত, গাড়ী হাঁকাবার জন্যে। বাতাসীর কাছে রাখ্‌তে দিল।

বুড়ি বল্লে—বৌ রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না! পাকা দাড়ি দেখে আগুন নিয়ে আস্‌ত। পরে নিজের উঠে আসা পাকা চুলগুলি হাতের মুঠিতে গুছি করে' নিয়ে বল্‌লে—বেশ মানাত কিন্তু।

মোড়ল ধান ভান্‌তে ভান্‌তে বল্‌লে—জমিদার আরো জমির বন্দোবস্ত দেবে। বাগিচা কর্‌ব—লিচুর। ক্ষেতের এ ধারে খালি সবুজ, ওধারে সোনা।

টিকে থাক্ এখানে। হুঁকো টান্‌বি আর সুখে থাক্‌বি। গায়ে মাটি মেখে কত সুখ।

পরে মাটি চষ্‌তে চষ্‌তে বল্‌লে—চাইনা কাউকে। এই ক্ষেতটাই আমার বৌ।

হুলো এসে বল্‌লে—বাবা, বাতাসীকে একটা নাক-ছাবি কিনে দাও না। ও চাইছিল।

বাপ্ বল্‌লে—তোর টাকার থেকেই দিস্।

ওরা হাট থেকে আগেই ফিরেছে। হাবার কোট্‌টা নিয়ে যাবার কথা আছে! তাই আমার যেতে দেরী হবে।

হাবার আবার কাল থেকে জর এসেছে।

ফিরে এসে বাতাসীকে শুধোলাম—কি হয়েছে রে বাতাসী? কে কাঁদছে?

ভূষণের বৌ। বাতাসীর চোখ মুখ ফোলা, ঝাপসা।

কেন?

হাবার হয়ে গেছে।

কখন? কি করে'?

ঘণ্টা খানেক আগে। জরের মধ্যে শুঁটকি মাছের ঘণ্ট চুরি করে' খেয়েছিল বলে' ওর মা সেই যে দরজার খিলটা দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারল, সেই বাড়িতেই—

অথচ নদীর গোঙানির সঙ্গে ভূষণের বৌর মরাকান্নার পাল্লা চলেছে।

ও-পাড়া থেকে দুলাল এল কাঁধ দিতে। আমায় বল্‌লে—একটা মাদার ফেড়ে ফেলি, আয়।

মাদার গাছটার পাঁজ্‌রায় পাঁজ্‌রায় যেন কান্না। হয়ত হাবার জন্যেই—

রোগা বেতো ঘোড়াটা পর্য্যন্ত দড়ি খুলে অস্থির হয়ে বট গাছটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরুগুলি গলা তুলে গাঢ় চোখে চেয়ে আছে,—জাবর কাটছে না।

বুড়ি আঁচলে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে হাপুরে গলায় ভূষণের বৌকে বল্‌লে—অত কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন লো লুটিয়ে লুটিয়ে?—এক ছেলে গেছে কত আবার হবে—

ভূষণের বৌ বুড়িকে খন্তা নিয়ে তাড়া করে' এল।—হারামজাদি ডাইনি বুড়ি, শকুনি,—তোর শাপেই ত' আমার হাবা,—আমার হাবারে—

তারপরে নদীর ককানির সঙ্গে তাল রেখে কান্না, বিনিয়ে বিনিয়ে।

হুলো মিনতি করে' বল্‌লে আমাকে—তুই এবার কাঁধটা বদ্‌লা। অনেকক্ষণ নিয়ে আছিস্‌। আমাকে দে এবরি।

তুই এতটা কাঁধই পাবি না। তুই পার্‌বি ওদের সঙ্গে চল্‌তে?

মোড়ল বল্‌লে—হঁ্যা, আমরাও ওর সঙ্গে ঠুকে ঠুকে চলি আর কি!

বাতাসী ডাক দিলে—চলে' আয় হুলো, আমরা পিছে পিছে চলি আস্তে আস্তে।

কাঁধটা বদ্‌লালেই পার্‌তাম।

চিতায় তোল্‌বার আগে ওর গায়ে কোট্‌টা পরিয়ে দিলাম। হুলো পাশের সজ্‌নে গাছ থেকে কতগুলি ফুল ছিঁড়ে ওর মুখে বুকে ছুঁড়তে লাগ্‌লো।

যেন কোট্‌টা পরে' ও হাসছে।

মাটির ওপর মুখ থুব্‌ড়ে বাতাসীর সে কী বুক-ভাঙ্গা কান্না! হাবা যেন ওর কে! হার ত' পুড়ছে না, ওর গায়েই যেন আগুন লেগেছে,—ওর বুকে।

তালগাছের মাথা পর্য্যন্ত আগুনের শীষ্‌ ওঠে,—যেন দূরের তারাকে ছুঁতে চায়।

পোড়া শেষ হয়ে গেলে হুলো কতগুলো ছাই নিয়ে মুখে বুকে পায়ে সর্ব্বত্র মাখ্‌তে লাগ্‌ল। দেখাদেখি বাতাসীও।

বল্লাম—তোরা একরাতেই সন্ন্যেসী হয়ে গেলি নাকি?

হুলো তেম্‌নি বল্‌লে—মরা মানুষের ছাই—

তারপর মাটির ওপর গড়্‌ করে' প্রণাম। বাতাসীর একেবারে সাষ্টাঙ্গ।

ফিরে এসে বাতাসী কুকুরটাকে বুকে নিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কুকুরটা যেন ওর খোকা!

হুলো ওর ডালিমগাছের পাশে চুপ করে' বসে' রইল।

মোড়ল ভূষণকে ডেকে বল্লে—মন খারাপ করিস্‌ নে ভূষণ! কত আসে যায়। সেই ত সেবার এক ক্ষেত মুলোর চারা হয়ে বৃষ্টিতে সব মারা গেল। এ ও তেম্‌নি।

ভূষণ বল্লে—নাঃ। গেছে, হাড় ক'খানা জুড়িয়েছে। রাত্তিরে ঘুমুতে দিতনা। ঝঞ্ঝাট্‌—মুখে বলে বটে কিন্তু চোখের জল মোছে।

মোড়ল বল্লে—আমারো মনটা সেবার ভারি দমে' গেছ্‌ল। অত ছোট খাটো দুঃখ নিয়ে থাক্‌লে কিছুই চলে না ভাই। এই প্রকাণ্ড মাঠের প্রতিটি ঘাস আমাদের ছেলে,—মাঠটা ওদের মা।

মোড়লের মনও ঠিক নেই। রাতে ক্ষেতের আল্ বেয়ে বেয়ে চলে, ঘুমুতে যায় না।

ঘোড়াটা মাঝে মাঝে বিকৃত শব্দ করে' ওঠে,—ঘায়ের যন্ত্রণায় হয়ত।

সমস্ত মাঠটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

সে রাত্তে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল, আকাশ ভেঙে। সঙ্গে ঝড়ের দুরন্তপনা। মেঘের কালো ঝুঁটি ধরে' ঝাঁকানি দিচ্ছে।

কলাগাছগুলি পড়ে' গেল—

নদীর জল ফুলে উঠেছে, ঝড়ে মাটির ঢেলা উড়্ছে, ধূলোয় সব দিক একাকার।

তার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি,—অন্ধকার চিরে চিরে তলোয়ারের ঝিলিক দিচ্ছে। মড়্মড়্ ক'রে একটা মাদারগাছও পড়্ল।

শুধু কুকুরটা নদীর সর্ব্বনাশা ডাক শুনে প্রতিধ্বনি কর্‌ছে। যেন কা'কে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম—নদীর পারে। নদী দুর্দ্দমনীয়, আমার পায়ের নীচের মাটিতে চিড়্ ধর্‌ল। সরে' এলাম। হুড়মুড়্ করে' পড়ে' গেল মাটির চাপ্‌টা।

নদী তা হ'লে এ দিকেও মাথা কুটতে লেগেছে।

পেছন চেয়ে দেখি,—বাতাসী। সব কাপড় চোপড় ভিজা, দুরন্ত ঝড় ওর সঙ্গে ফাজ্‌লামো লাগিয়েছে।

—উঠে এলি যে জলে?

ঝুলোকে খুঁজে পাচ্ছিনা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দু'জনে খুঁজতে লাগ্‌লাম। ধূলোয় কিছুই দেখা যায় না, চোখের ওপর জলের ঝাপ্‌টা লাগে।

বল্লাম—আমার হাতটা ধর্ বাতাসী। নইলে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে' যাবি।

বাতাসী আমার হাত চেপে ধরে,—ভিজা হাত, কিন্তু ভিতরের রক্ত যেন ফুট্‌ছে।

—ঐ যে ঐ যে ঝুলো। একটা বিদ্যুতের ধাঁধালো আলোয় আচম্‌কা দেখ্‌তে পেয়ে বাতাসী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি ঝুলোর ডালিমগাছটা ঝড়ের বাড়ি খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে' গেছে। ঝুলো সেটাকে দু' হাতে আঁক্‌ড়ে ধরে' ফের মাটিতে পোঁত্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

বল্লাম—ও কি আর বাঁচে? ফেলে রেখে ঘরে যা। ঠাণ্ডায় এবার ডান দিকটাই বুঝি ঠুঁটো কর্‌তে চাস্?

ঝুলো কেমন করে' যেন চোখের দিকে চায়—

অম্‌নি করে' অমলও একদিন চেয়েছিল!

পরের দিনও বৃষ্টি। সমানতালে চলেছে। বুড়ি বল্লে—কাকবোশেখি!

মোড়ল বল্‌লে—ঝড়টাই সর্ব্বনেশে। ঝাকাগুলো সব পড়ে' গেল। নইলে বৃষ্টিটাত' ভালোই। মাটি মেতে উঠবে।

বাজারে আজ আর কারু যাওয়া নেই। মাঠে জল থই থই কর্‌ছে।

মোড়লের ঘরে আজ সন্ধাইর খিচুড়ির নেমন্তন্ন।

রাতেও জল ধর্‌লনা। বরং আরো বেগে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হাত পা ছোঁড়া!

মাঝরাতে আবার উঠে এসেছি নদীর পারে। ফেনিল নদী পাক খাচ্ছে,—যেন নিজে নিজের চুল ছিঁড়্‌ছে।

পেছনে ফের বাতাসী। তেম্‌নি ভিজা গা, তেম্‌নি বাতাসের ইয়ার্কি ওর সঙ্গে।

বল্লে—নদী ত' নয়, মা-কালী। ব'লে হাত জোড় করে' প্রণাম কর্‌লে।

ও পারের পাটের কার্‌খানার খানিকটা ঝুপ্ করে' পড়ে' গেল। নদীটা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

বল্‌লাম—উঠে এলি যে আজো? অসুখ কর্‌তে চাস্ বুঝি?

আমার কাছে সরে' এসে বল্‌লে—ভারি ভয় কর্‌ছে কাঁচা।

হাতটা বুঝি একটু বাড়িয়ে দিলে। জোরে চেপে ধর্‌লাম।

—ঐ দেখ্, ঐ কাঁচা, একটা নৌকো ডুব্‌ছে।

একটা ডিঙি উল্‌টে গেল প্রায় পাড়ের কিনারে এসে।

কোন্ লক্ষ্মীছাড়ার নৌকো ? ঝড়ের তাড়নার মধ্যে আর্ত্ত-ধ্বনি মিলিয়ে গেল হয় ত।

—ও কি, কাপড় কাছ্‌ছিস্ যে ! ঝাঁপাবি নাকি ?

হাঁ, দেখ্‌ছিস্ না, মেয়েলোক—

—ক্ষেপেছিস্, কাঁচা ? বলে' পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বাধা দিতে চাইল।

বাতাসীর আলিঙ্গন থেকে নদীর বাহুবন্ধন বুঝি বেশি লুব্ধ করে। দুই হাত মেলে ঝাঁপ দিলাম। বাতাসী চীৎকার করে' উঠ্‌ল।

আমার হাতে বুকের সন্তানটিকে ফেলে মা তলিয়ে গেলেন, জলে—অন্ধকারে।

পাড়ে যখন উঠে এলাম, শিশুটি আর নেই। আগেই হয়ে গেছে।

—দেখি, দেখি। বলে' বাতাসী শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে নিজের ভিজা বুকের উপর চেপে ধর্‌ল। যেন ওকে গরম কর্‌তে চায়। ওর মুখে চুমোর পর চুমো দিতে লাগল। ওই যেন ওর মা, হারা ছেলে ফিরে পেয়েছে।

—চল্ চল্ ঘরে কাঁচা। সেঁক দিলে এখনো বাঁচতে পারে। বলে' আর অপেক্ষা না করেই মরা শিশু বুকে নিয়ে ঘরের পানে ছুটল উর্দ্ধশ্বাসে। যেন পাগলী হয়ে গেছে।

কিন্তু বৃথা !

তৃতীয় দিনে ঝড় বৃষ্টির মাৎলামি আর বুঝি সইল না। রাক্ষুসী নদীটা তার দুই পারের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় করে' ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি কোটী ফণা তুলে'।

ঢেউয়ের পর ঢেউ,—যেন মহাসমুদ্র।

সব ভেসে গেল,—মোড়লের স্বপ্নভরা ক্ষেত মাঠ জোত জমি, বাড়ী ঘর দোর,—সব। দিগন্তসীমা পর্য্যন্ত জলস্রোত। মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডে দুর্ব্বার তরঙ্গ তর্জ্জন। —সমস্ত মানুষের দুর্ব্বল আর্ত্তকণ্ঠ ছাপিয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে আর কিছু শোনা যায় না ! কুকুরটাও ভেসেছে।

সবাই ভাস্‌লাম, ভেসে চল্‌লাম নদীর অতর্কিত নিমন্ত্রণে,—আমি, মোড়ল, ভূষণ, ভূষণের বৌ, বুকের ওপরে গাবা, হুলো, হুলোর হাত ধরে বাতাসী,—আর বুড়ি। ও পাড়ার দুলালও।

এ পাড়া ও পাড়া,—সব।

গরু,—বেতো টাট্টুটাও। আরো কত !—হিসেব নেই, পাত্তাও নেই। বটগাছটা পর্য্যন্ত।

ভোর হয়নি, নদীর তড়কা তখনো থামে নি,—তখনো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মিছিল।

বুকের কাছে কি একটা এসে ঠেক্‌ল। যেন খানিক ভর পেলাম। ওকে সাপ্‌টে ধরে খানিকক্ষণ আরো ভাসা যাবে। আর যদি মর্‌তে হয় ত ওকে নিয়েই,—তলিয়ে গিয়ে।

—কে, বাতাসী ? আয়—

ও কোন জবাব দেয় না। আঠার মত অন্ধকারে সমস্ত আকাশ আর জল যেন আটকে গেছে।

ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ করে ওর মুখে নিবিড় চুম্বন দিলাম। জীবনে আর একবার।

আর একটা ঢেউয়ের হেঁচ্‌কা ধাক্কায় দুর্ব্বল হাতের বন্ধন থেকে ও খসে' ভেসে গেল।

হয়ত বানের জলে শ্মশান থেকে একটা পোড়া গাছের গুঁড়িই ভেসে এসেছিল !

স্বর্ণ-তোরণ

শ্রীসরোজিনী নাইডু

[শ্রীমতী সরোজিনীর নাইডু Golden Threshold পুস্তকের কতগুলি কবিতার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা]

পাল্কি বেহারা

তারে আস্তে ধীরে আস্তে ধীরে যাই যে বয়ে চলে,
মোদের গানের হাওয়ায় ফুলের মত দোদুল দোলা দোলে।
সে যে ঝর্ণা ফেণায় পাখির মত যায় গো চলি ভাসি,
যেন স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন দেখে ফুট্‌লো ঠোঁটে হাসি।

মোরা ফুল্লমনে গাইগো গান আস্তে চলি গণি,
তারে যাই গো বয়ে যাই গো বয়ে সুতোয়-বাঁধা মণি।

তারে আস্তে ধীরে আস্তে ধীরে যাই যে বয়ে চলে,
সে যে গানের শিশির-বিন্দু মাঝে তারার মত দোলে।
নাচে— স্রোতের মাথায় স্রোতের মাথায় নাচ্‌লো কিরণ-রেখা
ঝরে— প্রিয়ার চোখের কোণটি হতে একটি অশ্রু-লেখা

মোরা ফুল্লমনে গাই গো গান আস্তে চলি গণি,
তা রে যাই গো বয়ে যাই গো বয়ে সুতোয়-বাঁধা মণি।

গ্রাম্য সঙ্গীত

আমার সোনার যাদু কোথা তুই যাস্?
বাতাসে মাণিক সোনা ছড়াতে কি চাস্?
—যে তোর জননী ধাত্রী, ছাড়িয়া সে মায়
অশ্ব'পরি আসে বর, ব্যথা দিয়া তায়?

মা আমি চলেছি আজ গভীর কাননে,
চাঁপা গাছে কলি যেথা ফুটে আন্‌মনে;
কোকিলে কমলে দ্বীপ তটিনীর যেথা—
অপ্সরীর কণ্ঠ মোরে ডাকে শোন সেথা।

সুগন্ধি আরামে পূর্ণ বাছা ধরাখান
ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া বিবাহের গান
তাঁতে জাফ্‌রাণী তোরা বিবাহ-বসন
সন্দেশ করিছে তাঁ। কোথা যাবে ধন?

ছড়া আর গানে মাগো দুঃখ উঠে বাজি,
কাল মরণের বায়ু সূর্য্য হাসে আজি,
বনে যথা নদী গাহে সে আরো-মধুর
থাকিতে পারি না মাগো কারা ডাকে দূর!

ধানকাটার স্তোত্র

(পুরুষ)

কমলের সখা তুমি, তুমি প্রভু ধান্যের ঈশ্বর,
প্রভাতে সূর্য্য তুমি দানে দানে তুমি হে ভাস্বর ;
তোমার কৃপায় দেব ধরণীতে বীজের বপন,
লালিত পালিত হ'ল দিনে দিনে শিশুর মতন।
তোমার চরণে দেব গান দিই, মালা দিই আনি,
ফলের সোনালী আভা, মাঠের সোণালী ধান্যখানি।
কোমল সোনালী দীপ্তি দিলে দেব বন্দনা তোমায়,
বাজে করতাল বাঁশী হে বরুণ তব মহিমায়।

রামধনু সখা তুমি, তুমি প্রভু শস্যক্ষেত্র-প্রাণ,
সমুদ্র বরুণ তুমি দানে দানে তুমি হে মহান ;
তোমার কৃপায় দেব ধরণীতে পড়িয়াছে সীতা,
লালিত পালিত বীজ দিনে দিনে, তুমি তার পিতা।
তোমার চরণে দেব মালা আর ধন্যবাদ আনি,
ক্ষেত্র হতে গোলাজাত নূতন সোনালী ধান্যখানি,
বৃষ্টি ও শিশিরবিন্দু দিলে দেব বন্দনা তোমায়,
বাজে করতাল বাঁশী হে বরুণ তব মহিমায়।

(স্ত্রীলোক)

অলাবু ফুলের রাণী তুমি দেবী ধান্যের জননী,
সর্ব্বশক্তিময়ী তুমি, তুমি মাতা সুন্দর ধরণী,
উর্ব্বর তোমার বক্ষ আমাদের আহার যোগায়,
তোমার গর্ভেতে মাতা নিখিল সম্পদ জন্ম পায়।

তোমার চরণে দেবী মালা দিই প্রেম দিই আনি,
তোমার বহুল দান—তোমার দানের ভাণ্ডখানি
মোদের আনন্দধ্বনি, বন্দি মাতা বন্দি গো তোমায়,
বাজে করতাল ঢাক হে ধরীর তব মহিমায়।

(সকলে)

বিশ্বের স্বামী হে তুমি, আমাদের আত্মার দেবতা,
সনাতন পিতা তুমি কথার অতীত ওম্ কথা,
মোদের ক্ষেত্রের বীজ তুমি দেব তুমি কাস্তে তার,
তুমি হস্ত, তুমি হৃদি তুমি গৃহ চিরদিনকার।

তোমার চরণে দেব কর্ম্ম দিই, দিই হে জীবন,
রক্ষা কর, জ্ঞান দেহ, কর তুমি কর তুমি মোদেরে পালন।
তোমারে বন্দনা করি জীবন-জীবন, আশীর্ব্বাদ,
হে ব্রহ্ম তোমারে পূজি করতালে প্রার্থনা সম্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের ভাবরহস্য

("পূরবী"র ভূমিকা)

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন অপূর্ব্ব রহস্যময়। তাঁহার কাব্যলোকের মধ্যে একবার যাহার প্রবেশাধিকার লাভ ঘটিয়াছে, সমস্ত হৃদয় তাহার বিচিত্র রসমাধুর্য্যে, অপূর্ব্ব রূপ রহস্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন সেই জগতের নব নব রূপ, নব নব মায়া। রবীন্দ্র-কবিজীবনের হৃদ্‌-কমলটি সারাদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের সূর্য্যরশ্মিকে আপনার বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিকশিত পুষ্পটির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এক মায়াময় জগতের অতি বিচিত্র রসরহস্যমাধুর্য্যময় কাহিনী। সে কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য সমস্ত রসপিপাসু চিত্ত সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে।

রবীন্দ্র-কাব্য-লোকের মধ্যে যাহাদের গতিবিধি আছে তাঁহারাই একথা জানেন,কবিগুরু তাঁহার চারিদিকে কল্পনার এক বিশিষ্ট মায়ালোক সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ কবিজীবন এক চিন্তাস্তর হইতে অন্য স্তরে, এক ভাবরাজ্য হইতে অন্য ভাবরাজ্যে মুক্ত বিহঙ্গমের মত পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই 'দিনশেষের সায়াহ্নের গোধূলি আলোকের' পূরবী পর্য্যন্ত কত বিচিত্র ভাবরাজ্যের ভিতর দিয়া যে কবিচিত্তের যাত্রা—সে যাত্রা কোনো কালে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করে নাই। এই সুদীর্ঘ জীবনের সমগ্র ধারাটির সঙ্গে তার একটা নিবিড় যোগ আছে। এই যোগসূত্রটির সহিত পরিচিত হইতে পারিলে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার অমৃত উৎসের সন্ধান পাইয়া ধন্য হওয়া যাইবে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতকে বলিতে পারি কবিগুরুর কবিজীবনের সুস্পষ্ট প্রভাত। এর আগে যে সব চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া অকালে আলো স্ফুরণের নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র বলিলে হয় ত ভুল করা হইবে না। সন্ধ্যাসঙ্গীতেই বোধ হয় কবি সর্ব্বপ্রথম আপনাকে প্রকাশ করিবার একটা উচ্ছ্বসিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সকল কথা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; ছন্দ কোনো বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে নাই—হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করিবার ভাব ও ভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত হয় নাই। এই সব অসম্পূর্ণতার একটা বেদনা আছে। সে বেদনা কবিকে অনুক্ষণ পীড়িত করিতেছে কিন্তু এড়াইবার কোনো উপায় নাই; এই রকম একটা অবস্থার মধ্যেই সন্ধ্যাসঙ্গীতের সৃষ্টি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে সর্ব্বত্র যে একটা চঞ্চলতা ও তার সঙ্গে একটা বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কারণ ইহাই। কিন্তু প্রভাতসঙ্গীতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইয়া গেল। কোনো বাধা বন্ধই আর রহিল না। এর পরে 'ছবি ও গান' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কড়ি ও কোমল-এ','মানসী'তে 'চিত্রাঙ্গদা'য় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে কবির

যাত্রাপথ ও বিচিত্র ভাবরাজ্যের সহিত পরিচয় হয় ত কম বেশী সকলেরই আছে ; কিন্তু তবু 'পূরবী' বাহির হওয়ার পর তাহার সহিত নূতন করিয়া পরিচিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। নানান্ দিক্ দিয়াই পূরবী রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ; অতি নূতন অথচ অতি পুরাতন এক ভাব-রহস্য এই কাব্যখানিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। পূরবী তাঁহার কবিচিত্তের কোনো আকস্মিক স্ফুরণ নয় ; কবি-আপনাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া এক নূতন জীবনের আস্বাদন লাভ করিলেন। কিন্তু কবিচিত্ত শুধু এই ভোগের মধ্যে আপনাকে অধিকদিন ডুবাইয়া রাখিতে পারিল না ; 'মানসী'র শেষের দিকের কবিতাগুলিতে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় এবং 'রাজা ও রাণী' নাটকে এই সৌন্দর্য্য ভোগের মধ্যেও ভোগের প্রতি একটা অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। মনে হইল শুধু এই ভোগ আর ভাল লাগিতেছে না—কোথায় যেন কি অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে আরও ব্যাপক ও বিরাট্ কিছুর মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া, নিছক কল্পনাকে বাস্তবতার সংস্পর্শতায় আনিয়া তাহারই অনুভূতিকে ফিরিয়া পাইবার একটা ব্যগ্রতা ও চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল এবং এই ব্যগ্রতা ও চঞ্চলতা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল 'সোনার তরী'তে এবং তারপরে 'চিত্রা'য়, 'চৈতালী'তে এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি কাব্যে। এই সময়ের সকল লেখা হইতে প্রথমেই যে জিনিষটি আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা হইতেছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ ; এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সকল জিনিষের মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্যানুভূতি, এক অভিনব উপায়ে এই মনুষ্যলোক ও ভাবলোকের সঙ্গমতীর্থ প্রতিষ্ঠা। অতি তুচ্ছতম জিনিষটিও তাঁর দৃষ্টি এড়াইতেছে না—জলে যে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, নদীর চরে যে লোকটি বসিয়া বসিয়া বাঁখারী চাঁচিতেছে, গ্রামের যে মেয়েটি নদীর ঘাটে বসিয়া অঙ্গের বসন ফেলিয়া দিয়া গা ঘসিতেছে ; অতি তুচ্ছতম গাছপালা পশুপক্ষী কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না—সকলের মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল জিনিষ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপরূপ মায়ালোক সৃজন করিতেছে। কিন্তু শুধু এইটুকুই যদি হইত তবে ভাল করিয়া বুঝিবার হয়ত তেমন কিছু থাকিত না। এই ব্যাপকতর প্রেম ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গভীরতর সত্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য শুধু কবি-কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ গুটাইয়া 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা—বহু দিবসের সুখ দুঃখ আঁকা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতমাখা' এই সুন্দরী ধরণীর উপর স্থির হইয়া বসিয়াছে। সর্ব্বত্র সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য্য বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার তীব্র চেষ্টা ও আবেগ। জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিলে, সকল বহির্বিকাশের মূল অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য্য, সকল অনুভূতি যে ব্যর্থ হইয়া গেল। তাই 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' প্রভৃতি কাব্য ক'খানি জুড়িয়া সকল বৈচিত্র্যকে এক করিবার, খণ্ড খণ্ড সমস্ত ভাব, চিন্তা ও অনুভূতিকে এক অখণ্ড অসীমরূপে প্রকাশ করিবার, সকল বিচ্ছিন্ন কৌতুক আনন্দকে এক করিয়া গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার, সমস্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে ভোগলিপ্সা ও পার্থিব আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া শুধু সম্পূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে আপন হৃদয়ের মধ্যে ধারণের সার্থক চেষ্টায় ভরিয়া উঠিয়াছে। শুধু কাব্য ক'খানির ভাবই এই প্রকার তাহা নহে। যে ছন্দে এই ভাব রূপ ধারণ করিয়াছে সেই ছন্দেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। ছন্দের যে তারল্য এত কাল তাঁহাকে চঞ্চল তালে নাচাইয়াছে, দুলাইয়াছে, সে তারল্য আর নাই, সে চঞ্চলতা নিবৃত্তি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র একটা শান্ত সংযম ও ধ্বনির গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'সোনারতরী'র 'পরশ পাথরে' 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানসসুন্দরী' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় ; 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' 'এবার ফিরাও মোরে' 'উর্ব্বশী' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায়', চৈতালী'র সনেটগুলিতে এমন একটা সংযত শক্তি ও গাম্ভীর্য্য আপনি ধরা দিয়াছে যাহা পূর্ব্বে কোথাও খুঁজিয়া পাইনা। জীবনের নূতন দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের এই অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা কবিগুরু স্বয়ং সৃষ্টি

করিলেন এবং এই দুইয়ে মিলিয়া এই সময়ের কবি-জীবনকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিল। এই অপূর্ব্ব কাব্যলোক হইতে কি ভাবে কবি স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্‌লোকে এই যৌবন সম্পদ বন্দী হইয়াছিল এবং কি করিয়া 'পূরবী'তে এই অপরূপ সম্পদটি আরও নূতন ঐশ্বর্য্যে, নূতন দানে, নূতন তত্ত্বে সমৃদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার আভাস মাত্র এখানে লইতে চেষ্টা করিব।

বলিয়াছি, এই রসমাধুর্য্যে কানায় কানায় ভরা কবি-জীবন হইতে কবি স্বেচ্ছায় বিদায় লইয়াছিলেন। শুধু কবিজীবন, শিল্পসৃষ্টি আর ভাল লাগিল না। কিন্তু কি যে মন চাহিতেছে তাহারও পরিষ্কার কোন আভাস পাওয়া গেল না। শুধু বুঝা গেল, 'সোনারতরী', 'চিত্রা' 'চৈতালী'র জীবন হইতে বিদায় লইতে হইবে। 'কল্পনার' প্রথম দিকে শুধু 'কোথায়-কোন্ পথে' এই ক্রন্দন, শুধু অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া মরা; পুরাতন পথকে ত ছাড়িলাম কিন্তু নূতন পথের সন্ধান ত মিলিল না—তারই নৈরাশ্য! কিন্তু শেষের দিকে পথের সন্ধান মিলিল; কবি তাঁহার সমস্ত নৈরাশ্য ও ক্রন্দন 'বর্ষশেষে'র ঝড়ে এবং 'বৈশাখে'র খরদাহে রুদ্রতেজে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। এই দুই জীবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কবিতাগুলি নূতন ভাবরূপ পাইল বটে কিন্তু ছন্দ তাহার স্বীয় শক্তি ও গাম্ভীর্য্য হারাইল না। 'অসময়ে' 'দুঃসময়ে' 'অশেষে', 'বর্ষশেষে' 'বৈশাখে'—সর্ব্বত্র বিপুল শক্তির সংযত অথচ স্বপ্রকাশ গাম্ভীর্য্য আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই এক জীবন হইতে অন্য জীবনে যাত্রার একটা গভীর বেদনাবোধ আছে; সে বেদনার ক্রন্দন 'কল্পনা'র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সময় স্বদেশ ও স্বদেশের ইতিহাস একটা বিরাট ত্যাগের ক্ষেত্র ও আদর্শ ধীরে ধীরে কবির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিল। ইহার ভিতর আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষার একটু আভাস 'কল্পনা'তেই দেখা গিয়াছিল কিন্তু স্বদেশের শিক্ষা ও সাধনার মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিবার সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা দেখা গেল 'কথা ও কাহিনী'তে এবং ঐতিহাসিক নানান্ ছোটখাটো ঘটনাবলীর ভিতর হইতে স্বদেশের ত্যাগ ও তপস্যার সুমহান্ আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা গেল। এই ত্যাগ ও তপস্যার মন্ত্র উপনিষদের ধর্ম্ম হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া প্রথম সার্থকতা পাইল 'নৈবেদ্যে' এবং অন্যদিক দিয়া এই 'নৈবেদ্য' হইতেই কবির অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত হইল। 'নৈবেদ্য'র আগে আর একটি কাব্যগ্রন্থকে স্থান দিতে হয় যাহা 'কথা ও কাহিনী'র পরবর্ত্তী কালেই লেখা। সেটি 'ক্ষণিকা'। এই চটুল কৌতুকবিলাসপূর্ণ কাব্যটি কি করিয়া যে এই ওলোট পালোটের ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝেও আপনার স্থায়ী আসনটি দাবী করিয়া বসিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কবি ত বুঝিতেছেন মাধুর্য্যরসপূর্ণ গত জীবনের কাছে বিদায় লইতেই হইবে; বিচ্ছেদের বেদনা কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিতেছে না—ভাবিতেছেন, অতি তুচ্ছ কথাবার্ত্তায় হাসিয়া খেলিয়া এই বেদনাভারকে লঘু করা যায় কিনা। 'ক্ষণিকা'য় সেই চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু তার নীচে কবিজীবনের প্রিয়া-বিরহের কি যে অসহ্য বেদনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া মরিতেছে তাহাকে কবি কিছুতেই আর গোপন করিতে পারিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার প্রচেষ্টা তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবন হইতে পৃথক নয়। আমার মনে হয়, বৃহত্তর ত্যাগের ক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা যে কবির ভিতর আকুলি ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছিল সেই চেষ্টাটাই প্রথম স্বদেশ সাধনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু যখন সেই খণ্ড সাধনার সঙ্কীর্ণক্ষেত্র তাঁহাকে আর শান্তি ও তৃপ্তিদান করিতে পারিল না, তখন তিনি এমন একটা জগতে আসিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন যেখানে পার্থিব জনের নিকট তাঁহার কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঘটিল। এইখান হইতেই 'খেয়া'র সূত্রপাত। 'খেয়া' ত গভীর প্রেম ও সৌন্দর্য্যা-নুভূতির মাধুর্য্যরসপূর্ণ জগতের তীর হইতে তরণী বাহিয়া অধ্যাত্মজীবনের পরপারে খেয়া পার। গতজীবনের উপর যবনিকাপাত হইয়া তাহার সহিত বিচ্ছেদ একেবারে

পূর্ণ হইল। প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই নিবিড় যোগ আর অনুভব করা যাইবে না, অতি তুচ্ছতম ক্ষুদ্র বস্তুটিতেও সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার, ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ প্রয়াস—'to see a world in a grain of sand'—আর দেখা যাইবে না, সুখে দুঃখে ভরা এই পৃথিবী তার নানান্ রূপে কবির প্রাণে আর দোলা দিবে না—এ'র যে ব্যথা পাঠকের চিত্তকে কি তাহা ব্যথিত করে না? শুধু কি ভাবজগতেই কবি নবজন্ম লাভ করিলেন! রূপের জগতেও তার নবজন্ম লাভ ঘটিল। ছন্দের সেই সচল গতিবেগ অথচ শান্ত গাম্ভীর্য্য অন্তর্হিত হইয়া ভাব এখন গানের সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। গানের সুর যেখানে ভাবের বাহন সেখানে কথা বেশী বলিতে পারা যায় না—দুটি একটি কথা মনের পরিপূর্ণতা হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়া কানের কাছে কেবলি অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠে; মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অবসর আর থাকে না। সুর সেখানে সকল কথা মন হইতে টানিয়া বহির করে; সকল অকথিত বাণী, সকল মূক কণ্ঠকে বাধা দান করে—ছন্দলীলার স্থান সেখানে নাই। 'খেয়া' হইতে, বিশেষ করিয়া 'খেয়া'র পর হইতেই এই সুরের জগতের সৃষ্টি হইল এবং সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কবি সেই সুরের অনির্ব্বচনীয় রাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। 'খেয়া'র প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে 'নিজের কিছুই রাখিব না'—সর্ব্বস্ব আমার রাজার দুলালের চরণতলে সমর্পণ করিয়া দিব' এই দ্বিধা-শঙ্কাবিহীন ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের সুরই বাজিয়াছে। 'খেয়া'র শেষের দিকে ও তাই—শুধু যেন বরাবর মনে হইতেছে, 'নিজের বন্ধনে নিজেই জড়াইয়া গিয়াছি, নিজেই নিজেকে বন্দী করিয়াছি, আমার বলিতে যত কিছু—আমার শক্তি, আমার স্বার্থ, আমার গান, আমার স্বদেশ, আমার গর্ব্ব সকল কিছুর বোঝা বহিয়া বহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও'। সবকিছুকে পিছনে ফেলিয়া দিয়া এমন একটা জগতে ঢুকিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে যেখানে সকল প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অধীশ্বর, এই নিখিল ভুবনের অফুরন্ত রূপ ও রসের স্রষ্টা সকল জগতকে কল্যাণে পরিব্যাপ্ত করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যেখানে কোনো জিনিষই খণ্ডভাবে পাওয়া যায় না, সকল জিনিষ এক অখণ্ড স্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে সেই 'সব পেয়েছির দেশে'।

'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'কল্পনা'-ক্ষণিকা'র কবি—মানব ও প্রকৃতির প্রেম ও সৌন্দর্য্যের কবি; বিচিত্র রসনাভূতির কবি যে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে' এক অজানা অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অধ্যাত্মজীবনে জন্মলাভ করিলেন তাহা কিছুই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। আনন্দ ও অমৃতরসের সায়রে যিনি এতকাল ডুবিয়াছিলেন তিনি যে আনন্দস্বরূপকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন, সকল রস ও আনন্দের মূলে পৌছিতে চাহিবেন এ কথা ত খুবই স্বাভাবিক। সেই প্রচেষ্টাই 'গীতাঞ্জলি' হইতে ধীরে ধীরে সুরু হইল। এই কাব্যটিতে কয়েকটি ঋতু উৎসবের গান এবং আরও দুই একটি ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেকটি গানে এবং তার সুরে ঐ রসস্বরূপের চরণমূলে কি আকুলতা; সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্বকে অনুভব করিবার পৌছিবার জন্য অন্তরের কি তীব্র আবেগ; নিজের সকল অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া জীবন কুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য কি প্রাণপাত নিবেদন! কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে এই অধ্যাত্মসাধনায় কবিচিত্তের সহজ আনন্দ, সরল উপলব্ধি, অপরূপ লীলার কোন আভাস আমরা পাই না—পাই সাধনার বেদনা, সংগ্রাম, ব্যর্থতার ক্রন্দন। অথচ যতদিন পর্য্যন্ত এই জীবনে সাধনার আনন্দ সহজ হইয়া না উঠিল, উপলব্ধি সরল না হইল, দেবতার বিচিত্র ও অপরূপ লীলা সমস্ত চিত্তকে রাঙাইয়া ভরিয়া না দিল, সমগ্র জীবনের হাসি-খেলার সঙ্গে সমস্ত হোমতপস্যা মিশিয়া না রহিল, ততদিন লীলা ও সৌন্দর্য্যানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সে তৃপ্তি ও শক্তি, সে শান্তি ও আরাম লাভ হইল 'গীতিমাল্যে'। গীতিমাল্যের গানগুলির কি মুক্তগতি, কি স্বচ্ছপ্রাণ, কি কোমল সৌন্দর্য্য! 'গীতালীতে'ও কতকটা তাই।

কাব্য ও শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে, জীবনের স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য ও আনন্দের দিক হইতে 'গীতিমাল্য' যে 'গীতাঞ্জলি' হইতে শ্রেষ্ঠ একথা বলিতে আমার কোন দ্বিধাবোধ নাই।

'গীতিমাল্য' গাঁথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত হইল—সেটি 'বলাকা'। ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসের মধ্যে 'গীতিমাল্যে'র সমস্ত ফুল গাঁথা হইয়া গেল। 'গীতালী'র সবগুলি গান আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে লেখা। এই কয়মাস কেবলি গানের অফুরন্ত ফোয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে বলাকার আরম্ভ। 'গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালী'র কবি রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যে হঠাৎ 'বলাকা'য় জন্মলাভ করিলেন তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

মানুষ সারাজীবন সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, আশা ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যখন কিছুর মধ্যেই চরমশান্তি লাভ করিতে পারে না, তখনই সে ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁহার সহিত মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দে আপনি মশগুল হইয়া থাকে—আর কিছুরই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ইহাই সাধারণ মানুষের কথা; কবিজীবনেও প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিদেশের কবি, যাঁহারা মানবজীবনের সকল সূক্ষ্মরস ও অনুভূতির মধ্যে জীবনযাপন করিয়াছেন এমন কবিদের মধ্যে—যথা ব্রাউনিঙ, ফ্রান্সিস্ টম্পসন্,*—দেখা গিয়াছে তাঁহারা নানান বৈচিত্র্যময় রসানুভূতিকে শেষে অধ্যাত্ম রসানুভূতিতে ডুবাইয়া দিবার কবিচিত্তের যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে তাহারই সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন। আমরাও একসময় ভাবিয়াছিলাম 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালী'র রসবোধে সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানবচিত্তের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না তার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাঁহার কবিচিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবক্ষেত্র হইতে অধিকদিন রসসংগ্রহ করিয়া নিজকে সতেজ রাখিতে পারে না; কেবলি অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নূতন নূতন রসাস্বাদ করিবার আকুল প্রেরণা তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। অধ্যাত্মরসবোধের একটা স্বচ্ছ সহজ অতীন্দ্রিয় আনন্দ আছে বটে কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দরস তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। 'গীতিমাল্যে'র শেষের দিকে এবং 'গীতালী'তে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক রসানুভূতিকেও ছাড়াইয়া স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবোধ, তেমনি অন্যদিকে 'বলাকা'য় ধীরে ধীরে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাওয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে কবিজীবনকে যৌবনের উৎসবে পুনরাহ্বান করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। আমার মনে হয় তার একটা কারণ ছিল; অবান্তর হইলেও সে কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

একথা বোধ হয় কবিগুরুর অজ্ঞাত ছিল না যে, আমাদের এই জড়তার দেশে কিংবা পশ্চিমের কর্ম্ম-চঞ্চলতার দেশে সর্ব্বত্রই জীবনের শেষ অবস্থায় যে পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার মানব-চিত্তের একটা স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা, অসহায়তা এবং নির্ভরতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং যৌবনের তেজোময় স্বাধীনতা ও অকারণে উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগকে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা আছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার বিশ্বাস কবিগুরুর কাছে তাহা ভাল লাগে নাই এবং বোধ হয় সেই জন্যেই গীতিমাল্যে অনেক জায়গাতেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজের স্বাধীন সত্তাকে ভগবানের সঙ্গে একাসনে স্থান দিবার আভাস দান করিয়াছেন। মনের এই ভাবদশাই পরে, 'বলাকা'য় তাঁহাকে যৌবনের

* ব্রাউনিঙ-এর Feristha's Fancies; ফ্রান্সিস্ টম্পসনের 'Hounds of Heaven' এবং ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের Sands at Seventy যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন।

জয়গানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই সময় য়ুরোপের ক্ষমতা-মত্ত যৌবন যে প্রাণের তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়াছিল তাহার প্রতি কবির আন্তরিক অশ্রদ্ধা থাকিলেও যৌবনের সেই অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও সংঘাত যে কবিচিত্তকে একটুও দোলা দেয় নাই এবং 'বলাকা'য় তাহার ছায়াপাত হয় নাই একথাই বা কে বলিবে? যেমন করিয়াই হোক, বলাকা'র রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলী-গীতিমাল্য-গীতালী'র রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক —শুধু ভাবে পৃথক নয়, কলা কৌশলেও পৃথক। 'বলাকা'র ছন্দ যেন যৌবনেরই ছন্দ; দৃপ্তবেগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের নদী। আবার যৌবন যে ফিরিয়া আসিল তাহা ত কবি নিজেই বলিয়াছেন—

"বহু দিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।"

কিন্তু একটা জিনিস এইখানেই জানিয়া রাখা প্রয়োজন। অধ্যাত্ম মানবজীবনের অন্তর ও বাহিরের অমর তত্ত্ব অতি সহজে কবিচিত্তের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। 'বলাকা'য় প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই প্রেম, যৌবন অথবা সৌন্দর্য্যের জয়গানের অদ্ভুত প্রকাশ ভঙ্গিমার আড়ালে সেই সকল তত্ত্ব অতি নিপুণভাবে আপন অস্তিত্ব জানাইতেছে, মাঝে মাঝে তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টাও আছে একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে কি? কিন্তু সব চাইতে 'বলাকা'য় লক্ষ্য করিবার জিনিষ হইতেছে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে খুব উঁচুদরের একটা intellectul appeal—মানুষের চিন্তার প্রসব স্থানটিকে তাহা নাড়া না দিয়া পারে না।

১৩২৩ সালের মধ্যে 'বলাকা'র প্রায় সব লেখা শেষ হইয়া গেল। 'পলাতকা'র সবগুলি কবিতা ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজও সেই 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে'র জীবনে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে কিছুতেই এ সময় 'পলাতকা' সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। সকল হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, তিনি আপন হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত দেবতার চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যেই ত সকল অনুভূতি বিলীন হইয়া গিয়াছিল কিন্তু পলাতকায় দেখিতেছি মানব জীবনের সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ ঘর কন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে সুরু করিল; সে গুলিকে তিনি সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, মিলন বিরহের যিনি কাণ্ডারী তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাই দেখিতে পাইতেছি 'শৈল'র শিশুহাতের ক'টি আঁচড় কবির বুকেও চিরদিনের জন্য দাগা দিয়া গেল; আর রেল ইষ্টিশনের কুলী-মেয়ে রুক্মিণীকে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত করিবার দুঃখ কি শুধু 'বিনু'র স্বামীর বুকেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, কবির মনও কি সেজন্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল না? মনে হয় পলাতকা'র কবিতাগুলিতে শুধু নানান্ ভাবে, নানান্ ফুলে, গল্পকথায়, মানবচিত্তের নানান্ খুঁটিনাটির ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র মাধুর্য্য রসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে এর পরেই 'শিশু ভোলানাথে' শিশুজীবনের আনন্দলোকের রহস্যোদ্ঘাটনের মধ্যে কবি নিজে যে আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই জীবনের মধ্যে যে আনন্দ উৎসের সন্ধান সকলকে জানাইলেন তাহা সম্ভব হইত কি?

কিন্তু আমার বক্তব্য ইহা নয় যে, অধ্যাত্ম জীবনে অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছিল। আমি শুধু বলিতে চাই, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে কবি যে স্বাভাবিক গতিতে অধ্যাত্ম রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজনানুমোদিত সর্ব্বশেষ আশ্রয় তাঁহার চিত্তকে অধিকদিন অমৃতরস যোগাইতে পারিল না। তাই তিনি যে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহাতে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিচিত্র রসানুভূতিই বড় হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তৎসত্ত্বে

তাহাতে অধ্যাত্ম রসবোধ অতি নিপুণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং সকল রসের মধ্যেই অতি দূরের ইন্দ্রিয়াতীত-জগতের একটি ক্ষীণ অথচ মধুর সুর অনুরণিত হইতে লাগিল। এইকথাটি মনে রাখিলে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'র কবিজীবনকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই আধুনিক কবিজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা আমি অন্যত্র (রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২) বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

গৈবী

(কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নইকো গুরু, নইকো চেলা
নই তো মুরীদ পীর,
একও নহি, দুইও নহি—
এইটা জেনেই স্থির,
এম্‌নি করে'ই বিলাস করে
হর্ষে দাস কবীর।

হিন্দু বরে দেউল-ধেয়ান,
ম'জীদ—মুসলমান,
দুই প্রতীতি যেথায়, সেথায়
ধায় কবিরের প্রাণ—
সব বিরোধ, আর সব সমস্যার
যেথায় সমাধান।

হিন্দু মরে রাম বলে', আর
মুসলমান খোদা সে;
কবীর কহে,—সে-ই জীয়ে, যে
না যায় দোঁহার পাশে।
হিন্দু মুসলমানের বাইর
ভাইরে কবীর দাস এ!

হিন্দু যদি কহ আমায়,
হিন্দু আমি নই;
কইবে মুসলমান আমারে?—
দূরেই তবে রই।
পাঁচ তত্ত্বের গৈবী পুতুল—
নই রহস্য বই!

রহস্যেরই থেকে এলাম
রহস্যেরই মাঝে,
আবার যদি যাই ফিরে' সেই
রহস্যেরই কাছে,
খণ্ডতারি দোষটি তখন
কেম্‌নে কোথায় বাঁচে?

নিখিল স্রোত

শ্রীঅনুপম গুপ্ত

বাড়ীময় কান্না উঠ্‌ল; ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি সবই শুন্‌ছিলাম, সবই দেখ্‌ছিলাম। আমার কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি তখন কিছু ভাব্‌তে পার্‌ছিলাম না। ছাড়া-ছাড়া কথার পর কথা মনে আস্‌ছিল, আবার মানুষের নিশ্বাসের মতই যেন কোন্ শূন্যে সকলের অলক্ষিতে কথার পর কথাগুলি মিলিয়ে যাচ্ছিল। তখনো আমার জ্ঞান আছে। হঠাৎ মনে পড়্‌ল—কেন জানি না—যে, আপিসে সাহেবের কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে। না দিলে হয়তে চাক্‌রিটি চলে যাবে। এরা যদি সে কথা ভুলে গিয়ে থাকে! তার পরই মনে হ'ল, অনেক জায়গায় তো ধারধুর করেছি, এ মাসের মাইনে পেলেই তার কিছু কিছু শুধতে হবে। কথাটা কাকে বলি, ভাব্‌ছি, এমন সময় আমার বড় দিদি আমার মুখটি অতি সন্তর্পণে ধরে' দুফোঁটা জল আমার মুখে ঢেলে দিলেন। জলটুকু গলা পর্য্যন্ত গেল না। বেলপাতার একটা কাঁচাগন্ধে বুঝ্‌লাম ওটুকু নিশ্চয় গঙ্গাজল; কোনও ঠাকুরের চরণামৃত। মনে পড়্‌ল, আমার পৃথিবীর চলাফেরা শেষ হ'য়ে এল। কিন্তু আবার কে একজন একটা তীব্র ওষুধ আমার গলায় ঢেলে দিলেন। না গেলা পর্য্যন্ত সবাই আমার মুখের দিকে এমন করে চেয়ে রইলেন যে তাঁদের ম্লানমুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল; অনেক কষ্টে ঢোক গিল্‌লাম। সবাই আনন্দভরে চাপাস্বরে বলে' উঠ্‌ল, গিলেছে, গিলেছে!

আমার বিধবা পিসিমা চোখের জল আঁচলে মুছ্‌তে-মুছ্‌তে বল্‌লেন, বাবা তারকনাথ, এবার রক্ষে কর! মনে পড়্‌ল, তাও ত বটে, বেচারা বিধবা পিসিমা আমার, আমি যে তাঁকে গেল দু'মাস একটিও টাকা পাঠাতে পারি নি! অসুখে পড়ে, অবধি আমার ত সে কথা মনে পড়ে নি! গ্রাম্য বিধবা, গ্রামে বাপের বাড়ীর ভিটেটি আগ্‌লে আছেন, পাঁচটি করে টাকা পাঠাই মাসে মাসে, তাইতে নাকি তাঁর খরচ বেশ চলে যায়! দেশ থেকে যখন কোন লোক আসে, তার সঙ্গে আবার নারকেল নাড়ু কটা, একটু পাটালি বা খান কয়েক আমসত্ত্ব পাঠান। কোথা থেকে যে পয়সা পান, তা বুঝ্‌তে পারি না আমরা। অথচ আমরা এত পয়সা রোজগার করি, খরচ করি, আমরা ত পিসিমাকে বা আর কাউকে এমনতর কিছু দি' না!

আমার চোখের কোণ বেয়ে বোধ হয় তখন এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল, সবাই' বলে উঠ্‌ল, আহা, মুছিয়ে দাও গো, মুছিয়ে দাও।

ওদের অত দুঃখের মধ্যেও আমার একটু হাসি পে'ল।

কিশোর বয়সে বাবা মারা যান্, সংসারে মাথার উপর আর কেউ রইল না! সেই থেকে অভাবে, অসহায় ভাবে, কত ত্রাসে, ভয়ে কত চোখের জল ফেলেছি, সে জল আমাকে নিজেই মুছে' আবার কাজে মন দিতে হয়েছে।

একটুখানি বাতাস পর্য্যন্ত হাহা করে ওঠেনি, একটা গাছের পাতা কেঁপে ওঠে বলে নি, আহা! যাদের জন্য কেঁদেছি তারা আমার উপর রাগ করেছে, অভিমান করেছে।

বেশ বুঝ্‌লাম, এইবার বুকের ভিতর কল বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। নিশ্বাস টান্‌তে কষ্ট হচ্ছিল। একটুখানি বাতাসের জন্য হাঁ করে' আছি; পৃথিবীতে এত প্রচুর বাতাস, আমার বুকে একটু যায় না! এই বাতাসের ভয়ে কতদিন দোর জানালা বন্ধ করে ঘরে কাটিয়েছি!

মনে পড়্‌ল, নীলিমার একদিনের একটা কথা। তার তখন ধারণা বোধ হয় যে, সে আমাকে খুব ভালবাসে। একদিন সে বলেছিল, তুমি যখন আমার কাছে আস, তখন যেন সঙ্গে করে আমার নিশ্বাসের বাতাস নিয়ে আস।

মনে হল'-নীলিমা কই? এখন সে আমাকে একটু বাতাস ধার দিতে পারে না? আমি তাকে ত বহুকাল ধরে' তার নিশ্বাসের বাতাস বহন করে' এনে দিয়েছি।

নীলিমা, হাঁ, নীলিমা। সেই নীল চোখ ছুটি তার, সেই নারকেল পাতার মত তার ঝোলাঝোলা চোখের পাতা। তার চোখ দেখে মনে হ'ত, নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে যেন নীল আকাশের টুক্‌রো দেখা যাচ্ছে। কতবার সে কথা তাকে বলেছি। সে তখন প্রতিপদের চাঁদের মত ফ্যালফ্যাল্ করে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌তো।

মনে পড়্‌ল, নীলিমা এখানে নেই। নিশ্চয়ই সে আমার অসুখের কথা শুনেছে। ভাব্‌ছিলাম, সে এল না কেন?

এবার গলাটা একবারে শুকিয়ে এল, চোখের সাম্‌নে মানুষের চেহারা, দেয়াল, ছবি সব যেন এক নূতন ভঙ্গীভরে ছুল্‌তে লাগ্‌লো। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা দড়ি ধরে' খুব উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠ্‌ছি, অনেক দূর এগিয়েছি—নীচে বিশাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। দড়িটা যেন ছিঁড়ি-ছিঁড়ি কর্‌ছে আর বুঝি উঠ্‌তে পার্‌লাম না। আশেপাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম্ কিন্তু একটি তৃণও নেই যা ধরে ঝুলে থাক্‌তে পারি। শুষ্ক, বিরাট্ পাথরের পর পাথর গাঁথা। মনে হ'ল, দড়ি ছিঁড়্‌ল, অতল মহাশূন্যে নাব্‌ছি—আর হুঁস্ ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন দেখি, এক দিগন্ত-বিস্তার পদ্মবনের অফুরন্ত সাদা পদ্মের পাঁপড়ির উপর আমি শুয়ে আছি, আর কানে আস্‌ছে এক অতল গভীর অস্পষ্ট অশ্রান্ত ওঁকার ধ্বনি।

বুঝ্‌লাম, আমি জীবন স্রোতের জন্মশিখর থেকে মরণ সমুদ্রের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

মনে হ'ল, যাই ফিরে পৃথিবীতে। কত কি কাজ অসম্পূর্ণ রেখে এসেছি, কত কি কত জনের কাছ থেকে নিয়েছি, ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি, কত কথা বলে রেখেছি, সে কথা রাখ্‌তে পারি নি।

ফুলের সমুদ্র যেন নড়ে' উঠ্‌ল। ধীরে-ধীরে ফুলের সাগরে দোল উঠ্‌ল, ফুলের সাগর ভেসে চল্‌ল।

আমি নিরুপায়, নিঃসঙ্গ। পদ্মবন ভেসে চলেছে—মেঘের উপর মাথা রেখে আমি চুপ করে শুয়ে আছি।

মনে পড়্‌ল', একদিন নীলিমার কোলের উপর মাথা রেখে আমি শুয়েছিলাম, আর উদ্‌ভ্রান্ত আবেগে বল্‌ছিলাম, নীলিমা, আমি যেন মেঘের উপর শুয়ে' আছি। আজ যদি মরণ আসে! নীলিমা, চিরকাল থাক্‌তে পাব না এম্‌নি করে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাক্‌তে?

নীলিমা ধরা গলায় বলেছিল, আমিও তোমারই জন্য বেঁচে আছি, চিরকাল থাক্‌ব।

পদ্মবন গড়িয়ে পড়্‌ল প্রচণ্ড গতিতে একটা পাষাণ-স্তূপের উপর দিয়ে। সে কি ভীষণ গতি তার, কি দারুণ মুহূর্ত্ত! সহস্র খণ্ডে ছিঁড়ে পড়্‌ল পদ্মের মৃণাল, অসংখ্য ছিন্নফুলের পাঁপড়ি বাতাসের গায়ে উড়্‌তে লাগ্‌ল, সহস্রের মিলিত নিশ্বাসের মত শ্বসিয়ে উঠ্‌ল ফুলের সাগর

—তারপর, সবস্থির, ধীর, নীরব, নিশ্চল। মহাশূন্যে আকাশ দুলছে, আমি সেই আকাশে শূন্যপথে চলে বেড়াচ্ছি। মেঘ সরিয়ে, বাতাস কাটিয়ে আমি চলেছি—অভ্রভেদী তুষার-তোরণ আমার চোখের সাম্‌নে তার বিরাট কবাট খুলে দাঁড়াল। ভিতরে মানুষের আকার কায়া সঙ্গীতের সুরের মত এক স্বচ্ছন্দ ছন্দে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পায়ের তলায় ঠাঁই নেই, অঙ্গে কোনও আবরণ নেই; সাদা, নীল, লাল, সবুজ, হল্‌দে মেঘের আশেপাশে তারা চলাফেরা করছে। আর তারই অতি দূরে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত একটা স্বর্ণচক্র আগুণের হল্কার মত চূর্ণিত সোনার আলো ছড়িয়ে দিয়ে অবিরত ঘুরছে। এই কি নিখিলের জীবন-চক্র?

যাব কি যাব না, দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি। তুষার-তোরণ আমার দৃষ্টির সম্মুখে বন্ধ হ'য়ে গেল।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমারই মত সদ্য জীবন-মুক্ত কতগুলি নরনারী একটা পথ ধরে কোথায় যেন চলেছে।

তাদের একজনের দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে দাঁড়ালাম; সে এক নারী। সেও আমার দিকে তাকাল। সে বল্‌ল—তুমি কি শরৎ?

আমি বল্‌লাম—তুমি কি শেফালি?

বহুদিন পরে দুজনের দেখা হ'ল। আমা হতে বিচ্ছিন্ন ঐ পৃথিবীর ভিতরেই আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়।

সে বল্‌ল—চল, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আমি বল্‌লাম, কোথায় যাব?

শেফালি তার হল্‌দে ঠোঁটে সাদা হাসিটি হেসে বল্‌লে—কেন—পৃথিবীতে?

এ হাসি তার চিরন্তন; বহু পুরাতন, বহু দিনের এই তার মনোহর হাসি।

আমি বল্‌লাম, আমি যে পৃথিবী ছেড়ে এসেছি বেশি-ক্ষণ হয় নি!

সে আমার আরও কাছে এসে মুখের কাছে মুখ এনে বল্‌ল, অনেকক্ষণ, অনেক দিন হয়ে গেছে তুমি পৃথিবী ছেড়েছ। তুমি জান না, বহু দীর্ঘমাস তারপর কেটেছে।

আমি ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম, সে কতদিন হবে আমি সেই আত্মীয় বান্ধবদের আর্ত্তনাদ—মর্ম্মভেদী ক্রন্দনরোলের ভিতর দিয়ে মৃত্যুপথে যাত্রা করেছিলাম, সে ত সেদিন!

সে আমাকে ভাবতে দেখে বলল, হাঁ, সত্যিই ত সেদিন মাত্র। এই পথ দিয়ে বহুকাল আমাদের আনা-গোনা করতে হবে। এই স্মৃতির পথ পৃথিবীর উপর গিয়ে পড়েছে। চল, চল, ওরা যে আগে চলে গেল!

আমি ভাবলাম, পৃথিবীতে যাব? আবার সেই পৃথিবী, আমার সুখদুঃখ জড়ান, আমার হাসিকান্না, আদর-সোহাগ ভরা পৃথিবী; আমার আর্ত্তনাদ, আমার যন্ত্রণার বিরল কারাগার পৃথিবী! যাব, যাব, তারই কাছে ফিরে যাব। সেখানে আজ না জানি কত ফুল ধরেছে, ফল পেকেছে, গাছের পাতায় কত রঙের শোভা, পাখীর গান, মানুষের হাসি, মানুষের চোখের কথা;—আমার পৃথিবী, আমার অব্যক্ত দুঃখের কত আঘাত ঐ পৃথিবীতে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করে আছে—আমি যাব, তার সে আঘাত আমি মাথা পেতে নেব—আমার বহুদিনের চেনা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ঝড়ঝঞ্ঝায় উদ্বেলিত আমার সর্ব্বসহা মাটির পৃথিবী, যাব, যাব, আমি তোমারই কাছে ফিরে যাব।

শেফালি করুণ চোখ মেলে ডাক দিল, এস ভাই।

অফুরন্ত মানব-যাত্রীর অসংখ্য চোখগুলি আমার দিকে তাকিয়ে আমায় ডাক দিল, এস গো।

একটু যেতেই দেখি, পথের পাশে এক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে নীল আলোয় আলো-করা একটি মেয়ে গাছটাকে বলছে, বিরহ তোমার একলার নয়। ঐ দেখ, ওরা সব চলেছে পৃথিবীতে ফিরে। এই স্মৃতির পথে তুমিও যাবে, চল।

বৃদ্ধ অশ্বত্থ নিরুদ্ধ নিশ্বাস ফেলে বলল, সে যে আমার বহুকালের সঙ্গী, সে যে ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে, শীতে আমাকে তার বুকে জড়িয়ে রেখেছিল, সে যে আমার মাধবী!

মেয়েটি বলল, তবু ত তুমি তাকে পেয়েছিলে! কিন্তু সে যে আমার শরৎ, আমার বুকের আকাশ, আমি ত

তাকে বুকে ধরে' আঁকড়ে রাখতে পারি নি! সে চেয়েছিল, চিরকাল আমার বুকে শুয়ে থাকবে। ওগো, সে আমার জন্য বুঝি বসে আছে! আমি যে আবার যাব তার কাছে, আমি যে তার নীলিমা, আমি যে যৌবনের ব্যগ্রতা, তার বুকের শান্তি। চল, চল, পৃথিবীতে ফিরে চল, আবার যখন তুমি হরিৎ পাতায় পৃথিবীর উপর চোখ মেলে দাঁড়াবে, দেখবে, মাধবীও এক অক্ষুণ্ণ যৌবনের কামনা নিয়ে তোমার বক্ষের আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি শুনলাম, শরৎ, শরৎ—নীলিমা, নীলিমা। সবই ত আমার চেনা, ঐ নাম, ঐ কণ্ঠস্বর, ঐ কথা, ঐ ভাষা!

একটা সাদা মেঘের আড়াল থেকে ডাকলাম, নীল, ওগো নীল।

নীলিমা চমকে ফিরে দাঁড়াল, নীল মেঘেরই কোলে কোলে ভেসে এসে আমার কাছে থামল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি শরৎ, তুমি এখানে?

তার পর আমার বুকের উপর তার মাথাটি রেখে বলল—শরৎ, শরৎ, শরৎ।

আমি ডাকলাম, নীল নীলিমা, আমার নীল-পরী।

শেফালি বলল—যাই, যাই, যাই ভাই।

মেঘের কোলে ভাসতে ভাসতে আমরা চললাম, শেফালি আমাদের মাঝখানে। সে কথা বলে, আমি আর নীলিমা চোখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসি।

শেফালি বলে, আমার জন্য সে কতকাল ধরে' কাটাচ্ছে!

আমরা হেসে উঠি।

শেফালি বলে, সত্যি, সে আমাকে জীবনে পায় না, মরণ-কালে আমি তার বুকে মুখরেখে মরি।

নীলিমা বলে, সে কে রে, শেফালি? রাজপুত্র বুঝি? নেশায় বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে—

শেফালি বলে, না না, তার কথা অমন করে বলো না। সে সব শুনতে পায় কিন্তু একটি কথা বলে না!

আমি এবার হেসে বললাম, সে কে রে শেফালি? সেই বুড়োটা বুঝি? মন্দিরের দরজায় বসে ভিক্ষে করে?

শেফালি তার মন-ভোলান ছোট্ট হাসিটি হেসে বলে, ভাইয়ের মতই কথা বলেছ বটে!

নীলিমা বলে, কি শেফালি, রাগ করলি?

এম্‌নি করে আমরা পৃথিবীর কাছে এসে পৌঁছলাম। দীর্ঘ পথটি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আবার অমৃতলোকে গিয়ে উঠেছে।

শেফালি বলে, আমি তবে যাই?

নীলিমা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, যা তোর বুড়ো বর বসে আছে।

শেফালি খুব গর্ব্বভরে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই ত। ঐ দেখ আমার মাটি, আমার প্রতীক্ষার সুখে শরতের আকাশের দিকে চেয়ে আছে, কখন্ তার চিরদুঃখিনী গরবিনী শেফালি শরতের শিশির-তিলক এঁকে পৃথিবীতে আসে। ঐ দেখ তার সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে আমার যাবার পথ।

মাটি ডাকল, শেফালি, শেফালি—

রাজ বাড়ীতে শানাইয়ের সুর বাজছে। করুণ ভূপালির সুরে ভাসতে ভাসতে শেফালি বলল যাই, যাই।

আমি নীলিমাকে বললাম, ঐ দেখ পৃথিবীর মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঐ দেখ গাছের ডগায় ডগায় ফুলফোটার আয়োজন। ঐ দেখ সমুদ্রের বিক্ষোভিত বক্ষে শান্ত অপরিসীমতা।

নীলিমা আমাকে আর একদিক দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ মানুষে মানুষে সেই চিরন্তন কলহ, বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে চির-বিরোধ, সুখেদুঃখে অন্তরের বিক্ষোভ, প্রভুত্বে ও দাস্যে ঘেষাঘেষি, ভালবাসায় অধৈর্য্য। কামের তৃষ্ণা বাঘের মত ছুটোছুটি করছে। আর ঐ দেখ, মানবের না-পাওয়ার দুঃখ ক্লান্ত চোখে হরিণের মত তোমার দিকে চেয়ে আছে, শরৎ।

আমি বললাম, নিরন্তর এই না-পাওয়ারই চাওয়ার আবেগে নিখিল স্রোত চলেছে। মানুষের নীরবতার মধ্যে যে অনুচ্চারিত হাহাকার, বুকফাটা আর্ত্তনাদের

চাইতে সে বড় কম নয়। কামনার স্মৃতিপথ শিখর হতে বিশ্ব থেকে বিশ্বে বিশ্বে এই অভিযান।

বসন্তের বাতাস মাধবীর কানে কানে বল্‌ল, আবার সেই ফুটে ওঠার দিন এল!

মাধবী অশ্বথের শাখা হতে তার ঝুলান বেনী দুলিয়ে বল্‌ল, পরমদিনের স্মরণিকায় এই ফুটে ওঠারই ব্যাকুলতা লুকোন থাকে, তাই সত্য, জীবন মরণের নিখিল স্রোত।

রমাঁরলাঁ ও হিন্দুদর্শন

স্বনামখ্যাত ফরাসী মনীষী রমাঁরলাঁ দিল্লী হইতে উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত 'তেজ' পত্রে হিন্দু দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একটি সুচিন্তিত নিবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই নিবন্ধে তিনি বলেন :—ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে যত ধর্ম্মমত আছে, তাহাদের মধ্যে আমার মনে হয় যে, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। আমি অবশ্য অন্যান্য ধর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখিতেছি না। আদিম বৌদ্ধের পাণ্ডিত্যের মন্ত্রধ্বনি, অথবা ল্যাডভসির সেই নীরব গাম্ভীর্য্যের প্রশান্ত হাস্য—এই সমস্তই আমার নিকট অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে আমি এক এক সময় অসাধারণ ভাবরাশির সন্ধান পাই, আধ্যাত্মিক জীবনের অতি উচ্চ শিখর দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের চিন্তাধারা, বিশেষতঃ এশিয়ার চিন্তাধারা আমি পছন্দ করি, তাহার কারণ, এই চিন্তাধারা সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের চিন্তাধারার সহিত ইউরোপীয় চিন্তাধারা অপেক্ষা ভারতীয় চিন্তাধারার অধিকতর সামঞ্জস্য আছে। বিজ্ঞানের প্রগতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইতে পারিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সমূহ বিজ্ঞাপনের স্রোতধারায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে। শৈশব-দোলা হইতে তাহারা হিপারকাস এবং টলেমির নিকট হইতে যে স্বর্গের

কথা শুনিয়া আসিয়াছে, সেই স্বর্গ হইতে তাহারা যেন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। জীবনধারার গতিরেখার এক স্তর হইতে অন্যস্তরে অনুসরণ করিয়া আমি দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আমাকে বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত করিয়াছে। এই চিন্তাধারার মধ্যে আমি আইনষ্টাইনের মতবাদের বিপুল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই। আমি তখন আর আমাকে বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাই না। নক্ষত্রখচিত অসীম নভোমণ্ডলের মধ্য দিয়া, গ্রহ-উপগ্রহ ভেদ করিয়া, শত সহস্র বক্রপথ দিয়া, অগণিত ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া ভ্রাম্যমান লক্ষ

রমাঁ রলাঁ
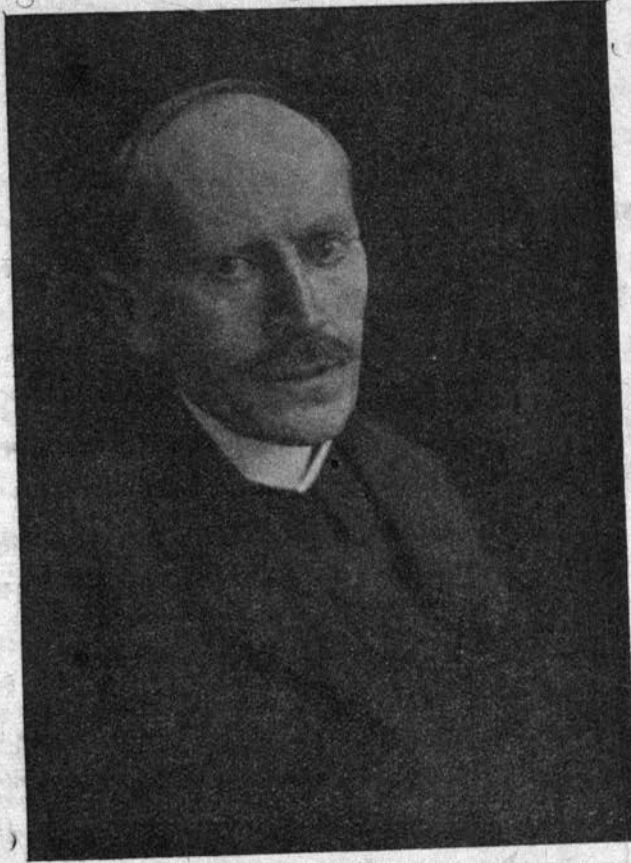
লক্ষ বিশাল জগৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমার মানস বিচরণের মধ্যে আমি শুনিতে পাই একটি বিশ্বসঙ্গীতের ঐক্যতান, যে সঙ্গীতের স্বরাবলী এক অপরকে অনুসরণ করিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, একবার লয় পাইতেছে আবার পূর্ণনাদে স্ফুট হইয়া উঠিতেছে, মানবের এবং দেবতার প্রাণের কথা কহিয়া কহিয়া তাহারা ছুটিয়াছে, অনন্ত ভবিষ্যতের বিধান অনুসারে তাহারা অনন্ত গতিতে চলিতেছে—ইহাই ব্রহ্মের সংসার—আমি সঙ্গীতধারা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ের মধ্যে শিবের তাণ্ডব নৃত্য অনুভব করিতে পাই।

পুরাতনী

বড় দিন

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

আবার বড় দিন আগত। আফিস আদালতের লোকেদের দুইটী বড় ছুটীর একটী ফুরাইয়াছে—আর একটী আগত। বড় দিন যে একটা পর্ব্বাহ এক ছুটী ছাড়া তা আমাদের উপভাগ করিবার আর কিছুই নাই। রাজার জাতিরাই সে আনন্দ উপভোগ করেন। কলকাতার বাজারে জিনিষপত্র আমদানি কেনা-বেচা যতই হউক না কেন আমাদের পক্ষে তাহার মহার্ঘ্যতা আনন্দের পরিবর্ত্তে বরং কষ্টের আধিক্যই বৃদ্ধি করে। ভেট পাওয়ার আনন্দও তাঁহাদেরই, আমরা দিয়াই মরি।

ইংরাজী ৯০-এর কোঠায় আমরা যখন কলকাতায় মেসের ছাত্র তখন আমরাও মহার্ঘ্য দ্রব্য দিয়াই বড় দিন করিয়াছি—অবশ্য কেক বিস্কুট দিয়া নয়, Vernacular ভাবে—ভীমনাগের সন্দেশ কমলা লেবু ইত্যাদি দিয়া। গুপ্ত কবির আমলে—বিলাতফেরত দল না থাকিলেও enlightened 'এজু' (educated) এবং old vernacular দুই দল ছিল। এই enlightened দল ইঁহাদের আর তরুণ দল বলা যায় না, ইঁহারা অনেক দিন থেকেই সমাজে একটা বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছেন। তখনও বিলাত এত কাছের পথ হয় নাই, কাজেই Prime york hams in canvas just in time for the Poojah—বাজারে আমদানী আরম্ভ না হইলেও পূজাপার্ব্বনীতে সাহেব সুবাদের আহারের নিমন্ত্রণ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়াছে এবং আমরাও তাঁদের বড় দিন নিজেদের একটা উৎসবের মত দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই সময়ের কলিকাতার বড় দিনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে তখনকার enlightened বাঙ্গালী পাড়ার চিত্রও সুন্দর বর্ণিত দেখিতে পাই।

যে সকল বাঙালীর ইংলিশ ফ্যাসন্।
বড় দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ॥

পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার॥

বাবুগণ কাবু নন নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা॥

দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা॥

ফ্রেস্-ফিস্ ভরা ডিস্ মাধ্যভাতে ভাত।
সেপাত সুপাত নয় নিপাতের পাত॥

অখিল ভরিয়া সুখে করে জল সেবা।
যেতে যেতে মেতে উঠে খেতে পারে কেবা॥
উরি মধ্যে দুঃখীতর বাঙ্গী সব ভেয়ে।
তত্ত্বহত মত্ত যত বড় দিন পেয়ে॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেনো জলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেকৃসের উপরে॥

পড়ে নি' ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি ॥
শাসনের ভয়ে নাহি যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি তুষ্ট হয় মনে ॥
ধনের অভাবে যেই বড় দীন হয়।
বড় দিন পেয়ে আজ বড় দীন নয় ॥

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সবে আরম্ভ হইয়াছে—রাণীগঞ্জ পর্য্যন্তও রেল পৌঁছায় নাই। শীতের সময় কাবুলী মেওয়া উটে করিয়া কলকাতায় চালান আসিত। সেবার সিপাই বিদ্রোহের গোলমালে লোকে হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল, বুঝি এবার বড় দিনে কাবুলী মেওয়ার আমদানি হবে না। ইহার মধ্যে খবর আসিল যে দুই শ' উট বোঝাই হইয়া কলকাতার দিকে মেওয়া আসিতেছে। ভোজন রসিক গুপ্ত সম্পাদক এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নিজেও আশান্বিত হইলেন যে, এইবার বড় লোকদের বাড়ীতে প্রচুর মেওয়া দ্বারা উদর পরিতোষ করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক আর একজন কবিও ১৮৫৭ সনের বড় দিন বর্ণনা করিয়া সাপ্তাহিক সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করেন। এ বর্ণনাটীও বেশ উপভোগ যোগ্য। ইহার রচনা হইতে 'ইংরেজী টোলা'র বর্ণনাটা শুনাই,—

বড় দিন বটে বড় বড়র নিকটে।
বড় দীন প্রতি বড় দিন নাহি ঘটে ॥
যেখানে টাকার ঘণ্ট সেইখানে ঘটা।
রমণীয় নানা দ্রব্য বিকাশিছে ছটা ॥
আকৃল্যাণ্ড হোটেলের আয়োজন ভারি।
কৈলাশ কি ইন্দ্রালয় বুঝিতে না পারি।
নানা উপাদেয় দ্রব্য মেজের উপরে।
লোভীর আকৃষ্ট মন বিমোহিত করে।
যে দেখেছে নয়ন স্বার্থক বলি তার।
যে খেয়েছে জন্ম তার না হইবে আর ॥
বড় দিনে বড় লোকে বড়ই প্রমোদ।
বড় বড় বন্ধু লয়ে করেন আমোদ।
বড় বড় গাড়ী চোড়ে গড়্‌গড়্‌ রবে।
বড় বড় বাড়ী যান ফুল্ল মনে সবে।
বড়ই খানার ধুম যথায় তথায়।
পেটুক জনেরা সুখে পেট ভোরে খায় ॥
কাঁদি কাঁদি কলা দেখি বাজারে বাজারে।
বড় বড় ভেটকি আইসে ভারে ভারে ॥
রম্ভাসম রামাগণ রম্ভা ভালবাসে।
চাঁপা রম্ভা পেয়ে সুখ সাগরেতে ভাসে ॥
কমলালেবুর কথা কি বলিব আর।
নগরে বাজারে লেবু খুঁজে মেলা ভার ॥
কমলার প্রিয়বন্ধু খৃষ্টিয়ান দল।
লইয়া কমলা করে হাসে খল খল ॥
কমলার প্রিয়জন কুতূহলে খায়।
কমলা-প্রিয়জনের অতিশয় দায় ॥
বাসনা পুরিয়া সুখ ভুঞ্জিতে না পায়।
অর্থাভাবে সদা ভাবে কি করে উপায় ॥

তখন "উইল্‌সন্‌ পুরোহিত"এর হোটেলের তত নাম ডাক হয় নাই। অকৃল্যাণ্ড হোটেলই তখনকার ফ্যাসনেব্‌ল (Fashionable) হোটেল—তবে ইহা উইলসনের মত Hall of all Natoins ছিল কিনা তা জানি না। আর অকল্যাণ্ড গার্ডেনে—kings Bench Walk এই ছিল তখনকার ফ্যাসনেবল কলকাতার প্রমোদ স্থান। অকল্যাণ্ড গার্ডেনে Agri-Horticultural একজিবিসন হইতে গোরা ব্যাণ্ড বাজিত—এখন ইহার চিহ্ন সম্ভবতঃ ইডেন গার্ডেনে বিলুপ্ত হইয়াছে।.

রমঁ্যা রলাঁ

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনুদিত]

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রভাত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু বিবাদ তাহাদের চলিতেই লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদের মধ্য দিয়াই যে বন্ধুত্ব টিঁকিয়া থাকে এ কথার মধ্যে কোন সত্য নাই। অটো ক্রিস্তফের দোষ দেখাইয়া যে অন্যায় অভিযোগ করিত, ক্রিস্তফ্ তাহা প্রাণপণে অস্বীকার করিত। নিজের মনেই নানারূপ তর্কবিতর্ক করিয়া প্রায়ই সে নিজের উচ্ছৃঙ্খল মেজাজের উপর দোষারোপ করিয়া বসিত। তাহার একান্ত অনুগত স্বভাবকে সে কখনও একটুও বাঁধিয়া রাখে নাই এবং প্রতিদানে তাই অন্যের হৃদয়ের সবটুকু সে চাহিয়া বসে—এতটুকু সঙ্কোচও সে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু আজ তাহারই সেই অকপট-হৃদয়কে ভালবাসার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা দিতে হইতেছে। তাহার ভালবাসার অংশীদার কেহ ছিল না। নিজেকে তাহার বন্ধুর জন্য উৎসর্গ করিতে সর্ব্বদাই সে প্রস্তুত ছিল এবং প্রয়োজন ও সততার দিক হইতে ইহাও সে না ভাবিয়া পারিত না যে, তাহার বন্ধুও তাহার জন্য তার সমস্ত, এমন কি নিজেকেও, বলি দিতে পারে। কিন্তু এইটুকু সে অনুভব করিতে সুরু করিয়াছিল যে, পৃথিবীর সকলেই তাহার-ই অকপট চরিত্রের আদর্শে গঠিত নয়। সে আরও বুঝিয়াছিল যে, সে এমন কিছু চাহিয়া বসে যাহা অপরে দিতে পারে না। সে আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিত। নিজেকে সে স্বার্থবাদী বলিয়া দোষ দিত—বন্ধুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার এবং তাহার ভালবাসায় একাধিপত্য করিবার কি এমন তাহার অধিকার আছে? নিজের যত কষ্টই হউক না কেন বন্ধুকে সে আন্তরিকভাবে স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করিত। নিজের হীনতায় ক্ষুব্ধ হইয়া অটোকে সে অনুনয় করিতে যাইত যেন সে ফ্রান্‌জ্‌কে অবহেলা না করে। সে স্বীকার করিতে চেষ্টা করিত যে, অটো অপরের সঙ্গ পাইয়া আনন্দে আছে, ইহাতে সেও সুখী হইয়াছে। অটো কিন্তু ক্রিস্তফ্‌কে বেশ চিনিত, তাই সে মিথ্যা

আনুগত্যের ভাব দেখাইত। ইহাতে ক্রিস্তফ্ অপ্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিত না এবং আবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

তাহাকে ছাড়িয়া অপরের সাহচর্য্যে বেশী সুখ পাও, যাও—ক্রিস্তফ্ তাহা ক্ষমা করিবে, কিন্তু মিথ্যাকে সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু অটো যে মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড ছিল এ কথা ঠিক বলা যায় না তবে তার পক্ষে সত্যকথা বলাও বিশেষ শক্ত ছিল—যেমন কোন তোত্‌লার পক্ষে স্পষ্ট করিয়া কথা বলা অসম্ভব। অটো যাহা বলিত তাহা যে নিখুঁত সত্য এমন নয়, কিন্তু তাহাকে একেবারে মিথ্যাও বলাও যায় না। হয় ভয় নতুবা স্বাধীনভাবে অনুভব করিবার দৈন্য স্পষ্টভাবে তাহাকে কিছু কহিতে দিত না। কোন উত্তরেই তাহার মতদ্বৈত ছিল না এবং ইহা ব্যতীত তাহার প্রত্যেক কথা এমন গুপ্ত রহস্যে পরিপূর্ণ থাকিত যে, ক্রিস্তফ্ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিত। অটো হয় ত কোথাও গিয়াছিল, ফিরিবার মুখে ক্রিস্তফের সহিত দেখা, কিংবা হয় ত সে এমন কিছু একটা করিয়াছে, বন্ধুত্বের খাতিরে যাহা তাহার করা উচিত ছিল না সুতরাং ক্রিস্তফের কাছে ধরা পড়িলে অপরাধ তাহার ত স্বীকার করিবেই না বরং নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানারূপ আজগুবি গল্পের সৃষ্টি করিয়া চলিবে। একদিন রাগিয়া ক্রিস্তফ্ তাহাকে মারিয়া বসিল। সে ভাবিল, বুঝি এইখানেই তাহাদের বন্ধুত্বের সমাপ্তি!—অটো কি তাহাকে কখনও ক্ষমা করিতে পারিবে? কিন্তু ক্রিস্তফ্ দেখে, কয়েক ঘণ্টার অভিমানের পর অটো আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

. . . যেন কিছুই হয় নাই। বন্ধুর এই অসদ্ব্যবহারের জন্য সে কিছুমাত্র রাগ করিত না—এমন কি ইহা তার যেন মন্দ লাগিত না—কেমন যেন একটা আনন্দ পাওয়া যায়। তবু তাহার এই ভাবিয়া ক্রিস্তফের উপর রাগ হইত যে, সে কেন তাহার সমস্ত দুষ্টামি হজম করিয়া নিজেকে প্রতারিত করিবার সুযোগ দেয়। এই জন্য অটো তাহাকে কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিত এবং নিজেকে বড় বলিয়া ভাবিত। এদিকে ক্রিস্তফ্ রাগ করিত এই ভাবিয়া যে, অটো কেন তাহার সমস্ত অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করে!

প্রথম মিলনের সে দৃষ্টি দিয়া আর তাহারা দুজনে দুজনকে দেখে না। তাহাদের দোষ পরস্পরের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ক্রিস্তফের স্বাধীনতা অটো আর তেমন প্রশংসার চক্ষে দেখে না। বেড়াইতে বাহির হইলে ক্রিস্তফের সঙ্গ তাহার অসহ্য বোধ হইত। কেমনটি হইলে ঠিক হয়, ক্রিস্তফের এ বিষয়ে আদৌ যত্ন ছিল না। সে যেমন খুশী পোষাক পরিত—হয় ত কোট্ পরে নাই, ওয়েষ্ট কোট্ খুলিয়া রাখিয়াছে, কখন বা কলার তাহার খোলা, হয় ত সার্টের আস্তিন গুটান, সময় সময় আবার টুপিটা ছড়ির উপর রাখিয়া বুক চিতাইয়া হয় ত চলিতেছে। চলিবার সময় সে হাত দুলায়। শিষ দেয় বা উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠে। মুখ তাহার লাল হইয়া উঠে,—ঘামে ধূলায় অপরিষ্কার দেখায়—যেন কোন চাষা হাট হইতে ফিরিতেছে। অটো উচ্চবংশজাত—ক্রিস্তফের সাহচর্য্যে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। হয় ত একখানি গাড়ী আসিতেছে, অমনি অটো কয়েক পা পিছাইয়া যাইতে চেষ্টা করে—যেন সে একলাই বেড়াইতেছে!

বাড়ী ফিরিবার সময় কোন চটিতে বা রেলগাড়ীতে চেনা-লোকের সহিত ক্রিস্তফ্ কথা বলিতে সুরু করে, এই জন্য তাহার সঙ্গ অটোর অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হয়। সে চীৎকার করিয়া কথা বলে, মাথায় যাহা আসে তাহাই বলিয়া বসে এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভাবে অটোর সহিত ঘনিষ্ঠতা করে। সকলের পরিচিত বা মাত্র কয়েক গজ দূরে বসিয়া আছে এমন সব লোকের আকৃতি সম্বন্ধে সে বেপরওয়া অভিমত দিয়া বসে, এবং নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বা তাহার পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে সে সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া শুনাইয়া যায়। অটোর চোখ রাঙানি'তে বা তাহার ভয় প্রদর্শনে কিছুই ফল হয় না। ক্রিস্তফ্ যেন তাহা দেখিতে পায় না বা এমন ভাবে ব্যবহার করে যেন সে সেখানে একেলা রহিয়াছে। যাহাদের সহিত ক্রিস্তফ্ কথা বলে তাহারা অটোর দিকে চাহিয়া মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসে—অটো লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাইতে চায়। ক্রিস্তফকে তাহার অভদ্র বোধ হয় এবং সে ভাবিয়া পায় না, কেমন করিয়া ইহারই সংসর্গে সে একদিন আনন্দ পাইয়াছিল। . . .

শুধু মানুষ সমন্ধেই নয়, বেড়া, প্রাচীর, ‘প্রবেশ নিষেধ’, জরিমানার ভয়, এমন কি যে কোন বস্তু তাহার স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিয়া স্বীয় ন্যায্য অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিত, সকলেরই সম্বন্ধে ক্রিস্‌তফ্‌ কতকটা প্রমাদী ও উদাসীন ভাবে চলাফিরা করিত। সর্ব্বগণই অটো ভয়ে ভয়ে থাকিত—তাহার কথায় কোনই কাজ হইত না। স্পর্দ্ধা দেখাইবার আতিশয্যে ক্রিস্‌তফ্‌ ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন অটোকে পিছনে লইয়া ক্রিস্‌তফ্‌ একটি বেসরকারী বাগান নির্ভয়ে পার হইয়া আসিতেছিল। ভাঙ্গা কাঁচে বাগানের প্রাচীর সম্পূর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য কিন্তু তাহাই তাহাদের ডিঙাইতে হইবে। এই চিন্তার ইতস্ততার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ সেই বাগানের মালীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। আর যায় কোথা! গালিগালাজে মালী একেবারে ‘পঞ্চমুখ’ হইয়া উঠিল এবং ‘থানাপুলিশ’ করিবে বলিয়া নানারূপ ভয় দেখাইয়া খানিকক্ষণ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিল; শেষে বিশ্রী অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদে অটো এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। জেলে যাইবার ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রিস্‌তফ্‌কে অনুগমন করিতে গিয়াই যে সে তথায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, ঠিক কোথায় যাইতেছে জানে না, এই কথাটাই সে বার বার বলিতে লাগিল। মুক্তি পাইবার পরও সে আনন্দিত হইল না এবং ক্রিস্‌তফ্‌কে বিশ্রীভাবে গালি দিল। ক্রিস্‌তফ্‌ই ত তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছিল? কিন্তু ক্রিস্‌তফের চোখের দিকে চাহিয়া সে এতটুকু হইয়া গেল। ক্রিস্‌তফ্‌ বলিল, কাপুরুষ!... ইহার পর খানিকটা কথা কাটাকাটি! যদি পথ জানিত অটো নিশ্চয়ই একলা চলিয়া যাইত কিন্তু এ অবস্থায় ক্রিস্‌তফের অনুগমন ব্যতীত আর গতি কি? কিন্তু দুজনেই এরূপ ভাব দেখাইতেছিল যেন তাহারা একাকী যাইতেছে।

একটা বিষম ঝড় উঠিবার উপক্রম হইতেছিল। বক্ষ-ভেদী রাগের মাথায় দুজনে তাহা লক্ষ্য করে নাই। দগ্ধ মাঠের বক্ষ ভেদ করিয়া পতঙ্গের চীৎকার উঠিতে লাগিল। চকিতে সব যেন নিস্তব্ধ।... কিছুক্ষণ পরে সেই স্তব্ধতা তাহারা অনুভব করিল। তাদের কানের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দ—দুজনেই আকাশের দিকে তাকাইল। বিরাট ঘন ঘোর মেঘে সমস্ত আকাশ কালোয় কালো... চারিদিক হইতে বিপুল অশ্বারোহী সেনার মত মেঘ ছুটিয়া আসিতেছে, ... আকাশের বুকে একটা প্রকাণ্ড ফাটল এবং তার মধ্যে কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট কোণে মেঘগুলো যেন শন্‌শন্‌ করিয়া ছুটিতেছে।... অটো ভয়ে কাবু, তবু ক্রিস্‌তফ্‌কে কিছু বলিবার ভরসা ওর নাই। ক্রিস্‌তফ যেন কিছুই দেখিতেছে না, এইভাবে অটোর উদ্বেগ যেন খানিকটা উপভোগ করিতেছিল। দুজনের মুখে কথা নাই, তবু তাহারা ক্রমশ দুজনের কাছে আসিতেছে। উদার মাঠের মধ্যে দুজনে একা। বাতাস বন্ধ... কখনও কখনও গাছের পাতা একটু নড়িতেছে, হঠাৎ ধূলা উড়াইয়া এক ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু গাছপালা মড়মড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। আবার নিস্তব্ধতা... আগেকার চেয়েও ভীষণ। কম্পিতকণ্ঠে অটো কথা বলিয়া ফেলিল, এ যে ভীষণ ঝড়, বাড়ী ফিরতে হবে।

ক্রিস্‌তফ্‌ বলিল, চল যাই।

কিন্তু দেরি হইয়া গিয়াছে। বিকট দীপ্তিচ্ছটায় চোখ ঝলসাইয়া বিদ্যুৎ!... সমস্ত আকাশ গর্জ্জিয়া উঠিল। মেঘের ছাদ যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝটিকা তাহাদের যেন জাপ্‌টাইয়া ধরিল। বিদ্যুৎ, বজ্র-নির্ঘোষ—মাথা ঘুরিতেছে... তার উপর বৃষ্টি! বিজন মাঠে দুজনে পড়িয়াছে! খুব কাছের বাড়ীও আধ ঘণ্টার পথ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে বৃষ্টির ধারা যেন চাবুক মারিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝড়-দৈত্যের রক্ত চক্ষুর বিকট কটাক্ষ!... দুজনে ছুটিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পোষাক-ভিজিয়া এত ভারি হইয়াছে যে, প্রায় চলাই অসম্ভব। জুতার মধ্যে পা পিছ্‌লাইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল পড়িতেছে। প্রায় নিশ্বাস ফেলাই শক্ত। অটো নিষ্ফল রাগে যেন ক্ষেপিয়া গিয়া দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতেছে। ক্রিস্‌তফ্‌কে অনেক নিষ্ঠুর কথা সে বলিতেছিল। সে থামিতে চেষ্টা করিল, বলিল, এখন চলা বিপদজনক—সে রাস্তায় বসিয়া পড়িবার ভয় দেখাইল। চষা ক্ষেতের মাটির উপর

সে শুইয়া পড়ে আর কি! ক্রিস্তফের ভ্রূক্ষেপ নাই! ঝড়ে, বৃষ্টিতে, বিদ্যুতে অন্ধপ্রায়, কর্ণ বধির, তবু সে এই অসুবিধাটা স্বীকার করিবে না।

হঠাৎ সব থামিয়া গেল। ঝড় যেমন আসে তেমনি যায় কিন্তু তাদের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। ক্রিস্তফ্ সাধারণতই এমন এলোমেলো পোষাক পরিত যে, এই বিপর্য্যয়ের প্রভাব তার মধ্যে ততটা লক্ষিত হইল না। কিন্তু অটো সর্ব্বদা পোষাকপরিচ্ছদে এমনই সৌখিন যে, তার বর্ত্তমান অবস্থা সত্যই শোচনীয় মনে হইতেছিল। পোষাক শুদ্ধ সে যেন স্নান করিয়াছে। ক্রিস্তফ্ তাহাকে দেখিবামাত্র অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অটো এতই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাগ করিবার মতও শক্তি আর তার ছিল না। ক্রিস্তফের মায়া হইল—সে তাহার সঙ্গে স্ফূর্ত্তির সহিত কথা বলিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ স্বরে অটো উত্তর দিল। একটি গোলায় অটোকে ক্রিস্তফ্ লইয়া গেল। ভীষণ অগ্নির সম্মুখে তাহারা শুকাইয়া উঠিল, সেইখানেই খানিকটা গরম মদ উভয়ে পান করিল। বিপদটাকে একটা কৌতুকের মত ভাবিয়া হাসিয়া ক্রিস্তফ্ ইহাকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এরূপ ভাবে ইহার রস গ্রহণ করা অটোর পক্ষে অসম্ভব, সে বাকি পথটা নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মান হইয়া চলিতে লাগিল। অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, তাই বিদায়ের সময় কেউ কাহাকেও অভিবাদন করিল না।

এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় সপ্তাহাধিককাল তাহারা পরস্পরের সহিত দেখা করিল না। উভয়েই উভয়কে কঠোরভাবে বিচার করিতেছে। কিন্তু একটি রবিবার একত্র বেড়াইবার আনন্দ হইতে পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া তাহারা এমনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, তাহাদের রাগটা পড়িয়া গেল। ক্রিস্তফই আগের মত প্রথম বোঝাপড়া করিল। অটো যেন কৃপাপরবশ হইয়া খানিকটা আগাইয়া আসিল, এইভাবে মিটমাট হইয়া গেল।

নানান বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকা যেন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। দুজনেরই যথেষ্ট দোষ আছে, দুজনই বেশ স্বার্থপর, কিন্তু এই স্বার্থপরতা ছেলেমানুষি মাখা। পরিণত বয়সের জঘন্য স্বার্থান্ধতা এখনও আসে নাই। এমন কি স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা সজাগই নয়। ইহার দরুণ পরস্পরকে সত্যই ভাল বাসিতে কোন বাধা হয় নাই। অটো কত কাল্পনিক প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী আপনার মনে রচনা করিয়া এবং নিজেকে মস্ত বীর নায়ক ভাবিয়া নিজেই কাঁদিয়া অস্থির হইত। তাহার উদ্ভাবিত করুণ কাহিনীর মধ্যে সে নিজেকে বীর, বলবান ও সাহসী পুরুষ-রূপে কল্পনা করিয়া তাহার কল্পলোকের অবাধ্য ক্রিসতফ্‌কে কতসময় রক্ষা করিয়াছে। কোন কোন অদ্ভুত বা মনোহর জিনিষ দেখিলে ক্রিস্তফ্ না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না যে, "অটোকে যদি এখন কাছে পেতাম! ক্রিস্তফ্ তাঁর বন্ধুর ছবিটি তার সমস্ত হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিল এবং সেই প্রতিলিপি সময় সময় অতি কমনীয় রূপধারণ করিয়া তাহাকে নেশায় একেবারে আবিষ্ট করিয়া তুলিত। কবে কোন্ অতীতে অটো দু'একটি কথা বলিয়াছিল তাহা স্মৃতির মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া তাহাকে আবেগে স্পন্দিত করিয়া তুলিত। দুই বন্ধু পরস্পরকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। অটো ক্রিস্তফের রীতিনীতি, চালচলন—এমন কি, তাহার লেখা পর্য্যন্ত নকল করিত। নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া ক্রিস্তফের প্রায়ই বিরক্তি ধরিত, যেন ইহা অটোর কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছে এবং সে সমস্ত মন দিয়া কথাগুলি অটোর বলিয়া ভাবিতে থাকিত। কিন্তু সে এটুকু দেখে নাই যে, সে নিজেই অটোকে অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে—তাহার পোষাক, তাহার চলন, এমন কি তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই। দুই বন্ধু যেন আত্মহারা হইয়া গেল। একজনের মধ্যে আর একজন মিশিয়া যাইতেছিল এবং তাহাদের হৃদয় স্নিগ্ধ অনুভূতির প্রবাহে আপ্লুত হইয়া গেল। ইহারই ছন্দে ঝরণার মত তাহারা নাচিয়া ফিরিতে লাগিল। এই আনন্দ-স্রোতের মূলে প্রত্যেকেই তাহার বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করে। হায়, তাহারা জানে না যে, তাহাদের যৌবনের উদ্বোধন-সঙ্গীত যে ইহারই ছন্দে সুরু হইয়াছে! . . .

* * * *

ক্রিস্তফ্ তার কাগজপত্র যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিত। কারণ সে কাহাকেও অবিশ্বাস করিত না। কিন্তু একটি স্বাভাবিক সঙ্কোচের বশে সে অটোকে লেখা চিঠির খসড়া এবং তার জবাবগুলি আলাদা করিয়া রাখিয়াছিল; বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে নাই। শুধু তার স্বরলিপির বই-এর পাতার মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল। সেগুলি যে কেহ দেখিবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল। তাহার ভাই-গুলোর শয়তানী মোটেই হিসাবের মধ্যে আনে নাই।

কিছুদিন হইতে সে লক্ষ্য করিতেছিল, তার ভাইগুলো যেন কেমন ভাবে তার দিকে তাকায়। পরস্পরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে' হাসাহাসি করে। কি যেন একটা উচ্ছ্বাসের খানিকটা অংশ আবৃত্তি করিয়া হেসে লুটোপুটি খায়। ক্রিস্তফ্ তা'দের কথা বুঝিতে পারে না এবং তার স্বভাব মত তা'দের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভরে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু দু'একটা কথায় হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গিল। সে সব যেন তারই পরিচিত কথা। ক্রমশ সে স্থির বুঝিল যে, তাহারা চিঠিপত্র পড়িয়াছে। একদিন তার ভাই দুটো পরস্পরকে 'আমার বুকের ধন' বলিয়া জ্যাদড়ামির উচ্ছ্বাস করিতেছিল। ক্রিস্তফ্ চটিয়া তাড়া দিল কিন্তু কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না। পাজি দুটা এমন ভাণ করিল, যেন ক্রিসতফের কথা তা'রা বুঝিতেই পারিতেছে না এবং পাল্‌টাইয়া বলিল—আমাদের যা-খুশী নিজেদের ব'লে ডাক্‌ব। ক্রিস্তফ খোঁজ করিয়া দেখিল, চিঠিপত্র যথাস্থানে আছে, সুতরাং বেশী পেড়াপেড়ি করিল না।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে একদিন আর্ণেষ্টকে ধরিয়া ফেলিল। ছুঁচোটা তার মা'র বাক্স হইতে পয়সা চুরি করিবার মৎলবে হাতড়াইতে ছিল। কষে ঝাঁকুনি দিয়া ক্রিস্তফ্ তার বিরুদ্ধে যা জমা ছিল সব উদ্গার করিল। এবং তার জ্যাদড়ামির তালিকাটি বড় ছোট নয়। কিন্তু আর্ণেষ্ট সে সব বক্তৃতা মোটেই ভাল ভাবে লইল না। বরং বেয়াদপি করিয়া বলিল, তোমায় আর আমাকে বকতে হবে না। অটোর সঙ্গে তোমার প্রেমের সব কথাই আমার জানা আছে।

এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতটার অর্থ ক্রিস্তফ্ প্রথমে বুঝে নাই। কিন্তু যখন তার মনে পড়িল যে, এই ঝগড়ার মধ্যে অটোকে টানা হইতেছে; সে কড়া সুরে আর্ণেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি বলিতে চায়! ছেলেটা ক্রিসতফ্‌কে খানিক খেলাইল এবং যখন সে রাগিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে হঠাৎ কথা থামাইয়া দিল। ক্রিসতফ্ বুঝিল যে, এ ভাবে সে কিছু বিশেষ আদায় করিতে পারিবে না। সে একবার গা ঝাড়া দিয়া আর্ণেষ্টের প্রতি ঘৃণা পূর্ণ অবজ্ঞা দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিল। ছেলেটা মজা পাইয়া আবার বেয়াদবি সুরু করিল এবং নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ বর্ষণ করিয়া ক্রিসতফকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতেছিল কিন্তু যেমনি সবটা বুঝিল, অগ্নি মূর্ত্তি হইয়া আর্ণেষ্টের উপর লাফাইয়া পড়িল। সে একটা কথা বলিবার অবসরও পাইল না—ক্রিস্তফ্ মেঝেতে গড়াইতে গড়াইতে আর্ণেষ্টের মাথাটা ঠুকিতে লাগিল। তার বিকট আর্ত্তনাদে লুইসা, মেলশিয়র সকলেই ছুটিয়া আসিল এবং সেই সাংঘাতিক অবস্থা হইতে ছেলেটাকে কোন মতে উদ্ধার করিল। মারের উপর মার—তবু ক্রিসতফ্ কি সহজে ছাড়ে! সে যেন একটা বুনো জন্তু—দেখাইতেছিলও তেমনি! তার চোখ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, তার দাঁত কড়মড় করিতেছে—সে শুধু যেন আর্ণেষ্টকে গুঁড়াইয়া দিতে চায়। সকলে যতই জিজ্ঞাসা করে, হয়েছে কি?—তার রাগ ততই বাড়িয়া যায়, শুধু বলে, আমি ওকে খুন করব! আর্ণেষ্টও' কোন কথা বলে না। ক্রিসতফ্ না পারিল খাইতে, না পারিল ঘুমাইতে। জ্বরে যেন তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে; বিছানায় পড়িয়া সে শুধু কাঁদিল! তার ভিতরে যেন একটা বিষম বিপ্লব চলিতেছে। কত বড় আঘাত যে তাকে আর্ণেষ্ট দিয়াছে তাহা সে বুঝিল না। ক্রিসতফ্ ভিতরে ভিতরে গোঁড়া নীতিবাদী—জীবনের তলায় যে বহু কুৎসিৎ জিনিষ আছে তাহা স্বীকার করিতেও যেন চাহিত না; একে একে সেই সবগুলি তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইতেছে—কী ভীষণ এই অবস্থা! এখন তার বয়স পনের।

প্রবৃত্তিগুলি তার বেশ প্রবল—জীবনও তার নির্ব্বাধ—তবু সে আশ্চর্য্য রকম সরল ছিল। তার প্রকৃতিগত শুচিতা ও নিরবিচ্ছিন্ন শ্রম—সব অবনতি হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। নিজের ভাইয়ের এই কুৎসিৎ ব্যবহার যে এক বিরাট নিরয় তার সামনে উন্মুক্ত করিয়া দিল। এ রকম নীচতার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। এখন সেটা সত্য প্রমাণ হইল দেখিয়া, বাঁচিবার, ভালবাসিবার, ভালবাসা পাইবার সব আনন্দ যেন এক নিমেষে ধ্বংস হইয়া গেল। শুধু অটোর সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়—সকল বন্ধুত্বের উপরই যেন কে বিষ ঢালিয়া দিল।

অবস্থাটা ক্রমশ খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। অল্প স্বল্প ঠাট্টা বিদ্রূপ কেহ করিলেই ক্রিস্তফ্ ভাবিত, তাহাকে লইয়া সারা শহর যেন কানা-ঘুষা করিতেছে। তাহার বাবাও অটোর সঙ্গে বেড়ানোর কথা লইয়া ঠোকর দিলেন, হয় ত বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া নয় কিন্তু ক্রিস্তফ্ নানান রকম গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিয়া বসিল এবং প্রায় নিজেকে দোষী ভাবিতে সুরু করিল। অটোরও এইরূপ সঙ্কটের অবস্থা চলিতেছিল। দুজনে গোপনে মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আগেকার সেই নিশ্চিন্ত ভাব আর ফিরিয়া আসে না। এই দুটি কিশোর নিবিড়ভাবে পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে। পরস্পরকে দেখিয়াই তাহাদের কত সুখ হইত, পরস্পরকে দেখিয়াই তাহাদের কল্পনা ও স্বপ্ন ভাগে উপভোগ করিয়া কি সুখই না পাইত; কিন্তু এখন সাধারণের নীচ সন্দেহের ছিটা লাগিয়া যেন এই মধুর সখ্য কলঙ্কিত হইয়াছে—সেই সরলতা নষ্ট হইয়াছে। অতি সহজ বিষয়ে তাহারা কিছু একটা মন্দের আতঙ্কে যেন শিহরিয়া উঠিত। একটু দৃষ্টি, একটু হাতধরা যেন লজ্জায় তাহাদের আরক্ত করিত। এমন ভাব লইয়া সম্বন্ধ বজায় রাখা অসম্ভব বোধ হইল।

কিছু না বলিয়া তাহারা দেখা সাক্ষাৎ তাহাদের কমাইতে লাগিল। তাহারা চিঠি লিখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কি লিখিতেছে সে বিষয়ে তাহারা সতর্ক। সুতরাং চিঠি লেখা হইল প্রাণহীন—তাহারা দমিয়া গেল। ক্রিস্তফ্ ওজর করিল, তার কাজ বড় বাড়িয়াছে। অটো বলিল, সে ভয়ানক ব্যস্ত। এইভাবে ক্রমশ চিঠিও বন্ধ হইয়া গেল। এমন সময় অটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিল। এবং যে বন্ধুত্বের দীপশিখাটি কয়েক মাসের জন্য তাহাদের হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছিল তাহা নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহা একটি প্রেমের শিখার পূর্ব্বাভাষ—এই প্রেম আর সবকে ম্লান করিয়া দিবে।...

—ক্রমশ

স্মৃতির আলো

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

তৃতীয় ভাগ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৭)

কৃষ্ণ-অষ্টমীর চাঁদ উঠ্‌তে বোধ করি রাত দুপুর হ'য়েছিল। হঠাৎ মুখের উপর চাঁদের আলোটা পড়াতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

দু-চার খানা ছেঁড়া মেঘের মধ্যে বিষণ্ণ মলিন চাঁদ খানি! সাম্‌নে সুবিশাল আকাশ, নীচে বিস্তৃত সমুদ্র। নির্জ্জন—একলা সুদূর পথের সেই পথিকটিকে দেখে—আমার মন কেমন একটা অজানা ব্যথায় ভ'রে উঠ্‌লো। মনে হ'লো :—কত না দুঃখ, নিঃসম্বল-একলা এই অফুরাণ পথ-চলায়, এম্নি ক'রেই নিরবলম্ব হ'য়ে ভেসে চ'লে যাওয়ায়। মনটা ধীরে ধীরে গম্ভীর, ভয়-ভারাতুর হ'য়ে ভারি হ'য়ে গেল।

বেঞ্চটা কেমন যেন ন'ড়ে উঠ্‌তে মাথা তুলে দেখি, একি! ইলা যে! স্তব্ধ-গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে সে!

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বল্লুম, ইলা; তুমি কতক্ষণ? রাত কি অনেক হয় নি?

ইলা নিরুত্তরে ব'সে রইল! এবার দেখ্‌চি দুর্জ্জয় অভিমানের পালা।

ইলা,—ইলা,—ইলা—, কোন সাড়া-শব্দ নেই!

একি! কথা কইছ না যে? তবুও সে মৌন হয়ে রইল।

মনটা আমার যেন শুকিয়ে উঠেছিল, অনুনয়-বিনয় করার ধৈর্য্যের পুঁজিটি পর্য্যন্ত যেন সব খুইয়ে ব'সেছি! তাই বেঞ্চের অপর প্রান্তে স'রে ব'সে—আমিও যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলুম।

খানিক পরে ফিরে দেখি ইলা চোখের উপর রুমাল দিয়ে কাঁদচে। তার ফোঁপানির শব্দ বোধ করি কানে এসেছিল! কিন্তু আমি নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য্যে তেমনি ক'রেই ব'সে রইলুম।

এমন ভাবে কতক্ষণ কেটেছিল জানি না, শেষে ইলাই কথা কইলে।

সে স'রে এসে কাছে ব'সে আমার পিঠের উপর হাত দিয়ে বল্লে, রাগ ক'রেছ ?

আমার কোন উত্তর না পেয়ে সে বল্লে, জানি, তোমার রাগের সমুহ কারণ ঘটেচে, ; কিন্তু বল, আমার কি দোষ, কি আমি ক'রেছি ? কি অপরাধে—তুমি এম্নি ক'রে আমাকে শাস্তি দিচ্চ ?

তার কথা শুনে, একদিকে যেমন বিস্মিত হ'লাম, অন্যদিকে কেমন যেন-একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠ্‌লো। তখনো কিন্তু আমার কথা-কইবার প্রবৃত্তি হ'লো না। চুপ ক'রে শুনে যেতে লাগলুম—সে-ই বা কি বলে।

ইলা বল্লে, আমার বাড়ী যাওনি, এ-কথা মনে ক'রে প্রথমটা আমার দুঃখ-অভিমানের শেষ ছিল না ; কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম যে, তোমার তরফে না-যাবারও অনেক যুক্তি থাক্‌তে পারে ; . . . যাবে কেন তুমি সেই পশুটার বাড়ীতে ? . . . সত্যইত ! পশু ? পাষণ্ড, কাপুরুষ . . . কত বড় অন্যায় ক'রে সে পালিয়ে গেছে ?

ইলা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে ;—কিন্তু কিরণ, তুমি ত ভাল করেই জান, জিঠানির সঙ্গে আমার মনের কোন যোগ নেই . . . একেবারেই নেই . . .

কথা এবার কইতেই হলো ? ইলা, তোমাকে অপমান, কি ব্যথা দেবার অভিপ্রায় আমার নেই . . .

কথা চাপা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বল্লে, থাক্ থাক্ কিরণ, আর কোন কৈফিয়ৎ তোমার দিতে হবে না। তুমি আমাকে যে অপমান করবে না, তা আমি সমস্ত মন দিয়ে জানি।

অবাক হ'য়ে আমি চেয়ে রইলুম। অনেকখানি আত্ম-সম্বরণ ক'রে সে আমার কাছে আরো স'রে ব'সে, আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে বল্লে, কিরণ, আমিও বোধহয় তোমার মত, এ জীবনে আর সেই হতভাগাকে মার্জ্জনা ক'র্‌বো না। আর সেও বোধকরি এ জন্মে এ-মুখো হবে না।

ইলার কথায় আমার বিস্ময় ক্রমেই গভীরতর হ'তে লাগ্‌লো। আশঙ্কায় ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠে ! কিন্তু প্রশ্ন করতেও ঠিক সাহসে কুলোয় না।

সে আবার বল্‌তে লাগ্‌লো :—নিশ্চয় তুমি সব কথাই নীলিমার চিঠিতে জান্‌তে পেরেছ। . . . আচ্ছা তোমাকেই আমি জিজ্ঞেস করি, সেও ত' জান্‌তো যে ঐ জানোয়ার-টার না আছে চরিত্রের ঠিক, না আছে মেজাজের ঠিক—ঘোর মাতাল ! কি সাহসে সে একলা, অত রাতে, অত দূরে, মোটরে গেল ? একটুও কি ভয় হ'লো না, একটি বারও কি মনে হ'লো না . . . ? এ-কি দুঃসাহসি-কতা ? এ-কি বিবেচনা ?

ইলা যেন নিজেকে আর রাখ্‌তে পারে না ! সে উঠে প'ড়ে জোরে-জোরে পায়চারি করতে' লাগ্‌লো—রাগে-দুঃখে তার বুকটা ফেটে যায় আর কি !

আবার বেঞ্চে ব'সে প'ড়ে বল্লে, উঃ ! তারপর কি ক'রেই কাট্‌লো সে রাত্তির ! মাথায় বরফ দিয়ে, হাওয়া ক'রে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না . . . ।

উঠে প'ড়ে আমার সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে বল্লে,—তুমি যদি থাক্‌তে কিরণ, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড হ'তো ! . . . আমি যদি পেতুম পাজিটাকে হাতের কাছে তো এই নখ দিয়ে তার মুখের চাম্‌ড়া তুলে নিতুম . . . কাপুরুষ ! বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ীখানা ফেলে রেখে যে উধাও হয়ে গেছে—আর দেখা নেই।

স্বপ্নাবিষ্টের মত বাক্যহীন হয়ে ব'সে বসে শুনে যেতে লাগ্‌লুম—আর ইলা ব'লে যেতে লাগ্‌লো ;—তাদের ফিরতে রাত হ'চ্ছে দেখে—বাবা ছট্‌-ফট করচেন—একবার ঘরে—একবার রাস্তায়। হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে এসে বল্লেন,—ইলা, সর্ব্বনাশ হয়েছে—ছ্‌টে আয় ছ্‌টে আয় !

গিয়ে গাড়ীর মধ্যে যা দেখ্‌লুম, কিরণ, জীবনে তা' আর কখনো দেখিনি . . . আমার পরম শত্রুও যেন কোন দিন তেমন না দেখে।

বেঞ্চের উপর ব'সে প'ড়ে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো

একি ! এ অনুতাপ, না, অভিনয়, না সত্যি-ব্যথার উদ্দাম আবেগ !

বহুক্ষণ কেটে গেল।

অবশেষে বল্লুম, ইলা, যা সম্পূর্ণ বিগত, তার জন্য আর আর কেঁদে কি হবে ভাই!

ইলা ব্যাকুল হ'য়ে বল্লে, আজ আমায় মন-প্রাণ খুলে কেঁদে নিতে দাও—ব্যথায় ব্যথায় আমার ভিতরটা চুরমার হ'য়ে গেছে... আজ তাই...

আমারও বুকের ভিতরটা—মনে হলো, যেন জমে পাথর হ'য়ে যাচ্ছে।

* * * * *

তখন সুদূর তট-ভূমি থেকে লঘু-চঞ্চল বাতাস শ্যামা-পাখীর করুণ কাকলি ব'য়ে-নিয়ে উষার বন্দনা সুরু ক'রে দিয়েছিল। দুজনেই বুঝলাম যে বাড়ী ফিরতে আর দেরি করা চলে না।

ইলা আগে আগে চল্‌ছিল, আমি পিছনে-পিছনে। সে থেমে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, সত্যিই কি তুমি আর আমাদের বাড়ী যাবে না?

কি মিনতি তার চোখ দুটিতে!

একটু হেসে বল্‌লুম, তেমন কোন প্রতিজ্ঞা ত' করি নি এখনো; তবে যদি বুঝি যে তাই করা দরকার—সেদিন আর কেমন করে যাবো?

ইলার চোখ দুটি একটু পুলকচঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বল্লে আর একটি অনুরোধ...

কি?

এক পেয়ালা চা, আমি নিজে ক'রে দেব, একটুও দেরি হবে না।

কথা না ক'য়ে আমি দু-পা অগ্রসর হ'তে সে বল্লে, কিছু বল্লে না?

না-ত বলি নি।

গুড্-বয়, বলে, সে উৎসাহ ভরে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লো।

খানিকটা দূর থেকে বল্লে, ইস্! দেখেছ, বাবা কি সকালে উঠেন, এর মধ্যেই উঠে পড়েছেন।

কৈ?

ঐ যে-ঐ, বাগানের পাশে, মালির ঘরের সাম্‌নে!

হাবুদত্ত আমাদের দেখ্‌চেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বাড়ীতে ঢোকবার সময় তাঁকে আর দেখা গেল না। তিনি ঘরে ঢুকেছেন।

ইলা, কৈ তোমার বাবাকে ত' আর দেখি না?

ইলা হেসে বল্লে, আড্ডা জমবে ভাল মনে ক'রে তাড়াতাড়ি যুৎ-সই ক'রে তামাক সাজচেন, নিশ্চয়। চল, তাঁর ঘরেই আগে যাওয়া যাক্।

তিনি কি ঐ ঘরেই থাকেন নাকি?

হ্যাঁ, তা তুমি জান না? বলেন, ওদিকে বড় গোল-মাল, সাহিত্য-চর্চ্চা করতে পারেন না।

বল্লুম, আজকাল ওদিকে বুঝি মন দিয়েছেন?

বল কি? আজকাল? চিরজীবন কবিতা লিখলেন। কত কাগজে সে সব বেনামি বার করেছেন। বাবা বলেন, তাঁর সব লেখা চুরি ক'রে, তাঁরই ভাব চুরি ক'রে কত লেখক দেশে নাম কিনে ফেলেচে।

বটে! তা তো জানতুম না।

ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লুম কবি একখানা ইজি চেয়ারে সমাসীন! চেয়ারখানি জীর্ণ কিন্তু কঠোর সংস্কারের পরিচেষ্টায়—অর্থাৎ বেদরদ পাড় এবং চটের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব আকৃতি ধারণ করেছে!

পাশেই একটি ধুনোচির মত বড় আকারের কলিকায় টিকের পিরামিড; তাতে ঘন-ঘন পাখার বাতাস দিয়ে দীপ্ত-স্ফুলিঙ্গ বার করচেন।

আমাদের উপস্থিতি কিন্তু তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌লেন না; বোঝা গেল, তামাকটা ধরার প্রতীক্ষায় তাঁর চির-চঞ্চল শক্তি-নিচয় আপাতত স্তম্ভিত।

কিন্তু অকস্মাৎ আমরা দুজনেই যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ এবং মাঝে মাঝে ঘূর্ণায়মান। দেখেই মনে হলো, তিনি ক্রোধ-বহ্নিমান।

হঠাৎ ইলা বল্লে, একি বাবা, তোমার কি অসুখ করেছে?

পলকে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন ফুলে উঠ্‌লো, চীৎকার ক'রে হাবু দত্ত বল্লেন, চোপ্, রাও শূ—বক্-বক্ করিস্ নি...

নিমেষে ইলার মধ্যে যেন একটা উগ্রতেজের বিদ্যুতের প্রবাহ ব'য়ে গেল। সে ফিরে দাঁড়িয়ে—যুদ্ধ-ঘোষণা সূচক বীর-বিক্রমের হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, কি—ই—ই—ই—ই—

টেবিলের উপরের ডিকাণ্টারটা সেই শব্দে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠ্‌লো।

তারপর ?

"স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥"

টিকের আগুনে সিল্কের কাপড় পুড়লো, চূর্ণ গেলাসের আঘাতে কপাল কেটে রক্তারক্তি!

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একি —এ আবার কি ? একি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম্‌!

ইলাকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে বল্‌লুম, ছিঃ, তোমার ঘরে চল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, এর চেয়ে আমার মরা ভাল —আমি আত্মহত্যা ক'রবো।

ভিতর থেকে হাবু দত্ত গর্জ্জন ক'রে বল্লেন, তা হ'লে আমার বংশ নিষ্কলঙ্ক হয়। তুই আত্মহত্যা না ক'রলে আমি তোকে শূট ক'রে ফাঁসি কাঠে ঝুলবো...

ইলা নিজের ঘরে পৌঁছে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল।

কিরণ, বুঝতে পেরেছ যে, অতিরিক্ত মদ খেয়ে এই দশা হয়েছে বাবার। তুমি তাঁকে ক্ষমা করো।...

তথাস্তু! বুঝলাম, জীবনের এই সঙ্কটময় প্রান্তরে মানুষ যত অল্প বিচরণ করে—ততই তার কল্যাণ!

৮

জেগে, ঘুমিয়ে, চোখ-চেয়ে, চোখ-বুজে কেবলই দেখতে পেতে লাগলুম, সেই মহাসমরের বিকট ছবি!

মনে মনে বল্‌লুম, হে সত্য, কল্পনা তোমার পায়ে শতবার নতি-স্বীকার ক'রে! স্বচক্ষে না দেখ্‌লে এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে ? কালে-কালে, এমনি ক'রেই মানুষ বুঝি বিজ্ঞ হ'য়ে উঠে!

কিন্তু মোটেই সময় ছিল না এই সব চিন্তায় দিন কাটা-বার—আমাকে সেই দিনই রওনা হ'য়ে যেতে হবে।

বাসা ছেড়ে পাখী যেমন ক'রে উড়ে যায় এক দিন, তেম্নি ক'রেই চলে যেতে মন যে চায়। এত দিনের সঞ্চয়, যা' ঘর ভ'রেছিল—আজকে সত্যই যেন সব আবর্জ্জনার মত ঠেকলো। কে দেখে, কেই বা গুছিয়ে দেয় ? কত কথাই মনে এলো; কিন্তু নাই, নাই, নাই যে সময়।

দুহাতে জিনিষপত্র বিলিয়ে দিয়ে, ঝাড়া-হাত-পা হয়ে সকাল-সকাল হরিলাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তিনি তেমনি ব'সে সমুদ্রের বাতাস সেবন কর-ছিলেন। অপ্রত্যাশিত সেই সময়ে আমার যাওয়াটা, তাই খুব খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন। আমাকে সেদিনই যেতে হবে শুনে আবার একদম মুশড়ে গেলেন।

খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, দেখি দিন কয়েক, তারপরে হয় ত' আমিও ফিরে যাবো। ভাল লাগে না কিছুই; মনে হয়, জীবনের সব রস ফুরিয়ে গেছে।

তারপর খানিকটা মাথা নীচু ক'রে ভেবে বল্‌লেন, সত্যি কিরণ, কি মারাত্মক না জীবন-শেষ হবার আগেই রস-বোধের ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়া। এখন একমাত্র আশা যে, শেষ অতি নিকটেই। কিন্তু দীর্ঘ সংস্কারের জন্যই বোধ হয়, তাতেও অমানুষিক ভয়।... এই সময় ভারি জান্‌তে ইচ্ছা ক'রে মৃত্যুর পরই বা কি আছে...।

তারপর শেক্স্‌পীয়রের বিখ্যাত লাইনগুলি আওড়াতে লাগ্‌লেন তিনি।

এই চির-গম্ভীর রহস্যটির আলোচনায় কোন ফল নেই ভেবে তাঁর মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় বল্‌লুম, আজ মিসেস্ দত্তকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে?

একটু গম্ভীর ভাবে হেসে হরিলাল বল্লেন, আর ঐ এক অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী দেখ! কিছুতেই কারুকে শান্ত হ'তে দেবে না—ঐ ব্যাটা হেবো! কি সব মাতলামি ক'রে শুনচি, আজ সকালে মেয়েটাকে ধরে মেরেছে ... ঐ সায়েবটার সঙ্গে ছুটে কি ভয়ানক কাণ্ডই না করলে সেদিন—তারপর সেটা ত গিয়ে বিলেতে ব'সে রইল, এটাকে ঠেকায় কে? ... কিছুতেই কি ওর নিবৃত্তি হবে না? একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! ... ইনি গেছেন কোন রকমে সেটাকে তাড়াবার জন্য; কিন্তু যাবেই বা কোথায়!—তাই ভাবি—দেনায় ত চুল বিকিয়ে আছে। ছেলে বেলা থেকে দেখে আস্‌চি ওকে —কোনদিন কি কারু সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পার্‌লে! ... অকৃতজ্ঞ, অলস, মাতাল, লম্পট—যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র! বদ্‌নাটাকে ওই মাটি করলে ...

এমন সময় একটা গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াল। বকৃতে বকৃতে বিরজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন।

হরিলাল চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো?

হবে আর কি? কিছুতে কি বেরুতে চায়? শেষ কালে ইলার পায়ে ধরে কান্না! মেয়ের অমনি দয়ার সাগর উথলে উঠ্‌লো!

ইষ্টিশানে রওনা ক'রে তবে আমার অন্য কাজ! যমের অরুচি!

আমাকে দেখে বিরজা একটু অপ্রস্তত হ'য়ে গেলেন। সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন, সকালের কুরুক্ষেত্রে ত' তুমি উপস্থিত ছিলে কিরণ, তুমি না সাম্‌লালে—ইলাকে খুনই ক'রে বস্‌তো।

হরিলাল বল্লেন, তবে আর দেরী করা নয়—এখ্‌খুনি খাইয়ে দেওয়া উচিত—ও যে আজই যাবে।

বিরজা ফিরে বল্লেন, ভালই হলো, একটু দেখে-শুনে সাম্‌লে নিয়ে যেও কিরণ!

মহা বিরক্তির সঙ্গে হরিলাল বল্লেন, আরে না, না, আর সাম্‌লে কাজ নেই! দেও না হ'তে একটু বে-সামাল। দিন কতকের জন্য শ্রীঘরে যায় ত'—দেখচি সব দিক দিয়েই ভাল।

বিরজা রাগ ক'রে বল্লেন, সে শুভ-যোগটুকুও আমার পোড়া কপালে নেই।

হরিলাল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, কেউ কিছুই জানে না কার কখন কি হয়!

একটু পরে আবার বল্লেন, ইলাকে এখেনে নিয়ে এলেই ত বেশ হতো?

উত্তরে বিরজা বল্‌লেন, সে আস্‌তে চায় না—আমাদের সেখেনে গিয়ে থাকৃতে বলে।

হরিলাল বল্‌লেন, তাই কি আর হয়? এত নড়াচড়া করা কি আর সম্ভব; তা যদি করতেই হয় ত' কলকেতা চ'লে যাওয়াই ভাল ... কিরণের ভরসাতে আসা, সে-ই ত চলে গেল!

বল্লুম, ভারি দুঃখ হয়, যখন মনে করি যে, এইটুকু সামান্য কাজেও লাগ্‌লাম না আমি।

তুমি কি করবে বাপু? চাকরি কর, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।

বল্‌লুম, আগে জান্‌লে, আরো মাস দুই ছুটি নিয়ে ফেল্‌তুম।

মিসেস দত্ত বল্‌লেন, হ্যাঁ কিরণ, এখন আর তা হয় না বুঝি?

বল্‌লুম, হ'তেও পারে। দেখি সায়েবকে সব কথা ব'লে ছুটি করতে পারি ত' দিন আষ্টেকের মধ্যে ফিরে আস্‌বো।

শান্ত সজল চোখ দুটিতে হরিলাল আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, এত সুবিধে কি আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে কিরণ!

* * *

* *

*

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। হাবু দত্ত ছুটে এসে আমাদের গাড়ীতে একটা চাবি খোলা, দড়ি দিয়ে বাঁধা টিনের তোরঙ্গ—আর একটা চটের ছালাতে বাঁধা তৈজসপত্র ফেলে দিয়ে বল্লেন, এ গুলো তোমার জিম্মায় রইল, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার খবর নিয়ে যাবো।

বলেই ছুট্।

ব্যাপার কি বুঝে উঠ্তে পারলুম না। গোটা দুই ষ্টেশন পরে হাবু বাবু আমাদের গাড়িতে এক লাফে উঠে পড়তেই, গাড়ি ছেড়ে দিলে। ছুটে এসে বে-দম। খানিকটা দম নিয়ে বল্লেন, ব্যাটা ট্যাস, হাবু দত্তকে ধরবে সাধ্য কি তোমার?

কি হয়েছে?

ঐ একশালা ফ্লাইং-চেকার; যেন গাড়িতে গাড়িতে গরু খোঁজা করে ফিরচে।

তাতে আপনার ভয় কি?

হাবু দত্ত একটু চ'ড়ে উঠে বল্লেন, ভয়? এই দুনিয়াতে শখা কারুর ভয় রাখে না। তবে কিনা বেটা ধরতে পারলে দুচার আনা খসাবে।

কেন?

এঃ তুমি নেহাৎ নাবালক দেখ্চি। W. T.; কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লেন, উইদাউট্ টিকিট!

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম; কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন; বল্লেন, এই জোচ্চোর বেটাদের পয়সা দেওয়া—বুঝেছ কিনা, স্রেফ্ গাধামি!

জোচ্চোর কিসের?

বিঁড়িতে সজোরে টান দিয়ে হাবু বল্লে, এঃ নেহাৎ শিশু দেখ্চি; এই সহজ কথাটা জান না? এই ধর, লাইনটা চল্‌চে ত' থার্ড ক্লাশের ভাড়ার জোরে? কিন্তু দেখ্‌বে চল গাড়িতে একটু ঝাঁট পর্য্যন্ত পড়ে না। আর যাও গিয়ে দেখ ফার্ষ্ট সেকেনের আমিরি হাল। কি বাবা—ক'জন চড়চে ফাষ্ট কেলাশে? কত টাকা হয়, শুনি?

বিঁড়িটার শেষাংশ ফেলে দিয়ে বল্লেন, জান বিলেতে কোন তফাৎ নেই থার্ড আর ফাষ্টের? জো কি? সে যে গ্ল্যাডষ্টোনের দেশ! বেটারা ভীষণ জোচ্চোর ... শাস্ত্রে আছে, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! জান হে, বয়েস অনেক হলো—কত দিল্লি-লাহোর মেরে এসেচি; কিন্তু একটি পয়সা উপুড় হস্ত করি নি! হুঁ-হুঁ—এত আহাম্মক নয়,—হাবু দত্ত!

আড়া-মোড়া ভেঙ্গে হাবু দত্ত বল্লেন, কিন্তু রাত্রে ত' ভাল ক'রে ঘুম দিতে হবে' বাবা! আচ্ছা, আচ্ছা, তার ব্যবস্থাও আছে। হাবুদত্ত কিসে পিছ-পাও?

তোরঙ্গটার দড়ি গাছা ধাঁ ক'রে খুলে ফেলে তা থেকে একখানি আধ-ময়লা শাড়ি বার ক'রে ফেল্লেন। সেটি হাতে ক'রে নিয়ে বল্লেন, এইটি জড়িয়ে নিয়ে সটান্ মেয়ে গাড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক। সেখানে বাছাধনদের ট্যাঁ-ফোঁ চল্‌বে না।

গাড়ি থামতেই টপ্ ক'রে নেমে হাবু বাবু টিনের পায়খানার মধ্যে ঢুকে পড়তেই—গাড়ি ছেড়ে গেল।

তাঁর কেরামতি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম; কি মাথা!

দশটা কি এগারোটা হবে, গাড়িখানা চলেছে—অসীম বেগে অন্ধকার ফুঁড়ে দেশ-দেশান্তরের মধ্যে দিয়ে। সেই বিপর্য্যয় দোলায় ছেলে-বুড়ো, কেউ বাদ নেই, সবাই ঘুমে কাতর। কেউ কাউর ঘাড়ে ঘুমিয়ে ঢুলে পড়ছে—কেউ বা একটা বেঞ্চে দস্তুর মত বিছানা ক'রে, লম্বা হ'য়ে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন।

অকস্মাৎ কান্নার কল-রোল উঠ্‌লো মেয়ে গাড়িতে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আশ-পাশের গাড়ীর যাত্রীরা জেগে উঠে নিস্ফল-আস্ফালনে তর্জ্জন করতে লাগ্‌লো;—পাকড়ো শালাকে, মারো শালোকো। কেউ বা বল্লে—আরে কি হয়েছে আগে খবর নেও।

তখনো চেন টেনে গাড়ি থামাবার হিকমৎ বার হয় নি। তবুও গাড়ি থাম্‌লো। চেঁচানির ছোঁয়াচ্ এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়তে যেতে-যেতে—শেষকালে গার্ড সায়েব—তাঁর রক্তচক্ষু লণ্ঠন দুলিয়ে দিতেই গাড়ি থেমে গেল।

গলা বাড়িয়ে শিশুটি পর্য্যন্ত দেখ্‌চে ব্যাপার কি?—এমন সময়, একটা মানুষ তীরবেগে মেয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে অন্ধকারের মধ্যে নিমিয়ে মিশিয়ে গেল।

চারিদিকে বিপুল চীৎকার হলো; বাহিরে বাহিরে

—ওহিরে শালা ভাগা! ... পাকড়ো শালাকো—মারো শালাকো...!

কিন্তু ধরবার এবং মারবার কোন চেষ্টা কেউ জিহ্বা-স্পন্দন ছাড়া, ক'ড়ে আঙুলটি নাড়িয়েও করলে না!

গার্ড নেমে এসে প্রশ্ন করলেন, কেয়া হুয়া?

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—গাড়িতে বদমায়েস ঢুকেছিল।

কেয়া কিয়া?

ভাগ গিয়া।

কাঁহা ভাগা?

অন্ধকারে, ভগবান জানেন কোথায়!

গার্ড সিটি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

রাত্রে দুশ্চিন্তায় আর আমার ঘুম এলো না—তাই তো হাবুকে সাপেই খায়, না বাঘেই খায়!

—ক্রমশ

পুস্তক ও পত্রিকা

পরিচয় লিপি

বাঙ্গালীর খাদ্য :—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দাম আট আনা। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের "খাদ্য"-এর পর এরূপ ধরণের অন্য কোন বই বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। রায় বাহাদুর আমাদের দেশের প্রচলিত খাদ্যসমূহে কিরূপ পরিমাণে ফ্যাট্, কার্ব্বোহাইড্রেট্, প্রোটিন্ আছে, তাহাই রাসায়নিক পরীক্ষায় নিরূপণ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানে সম্প্রতি আর একটি জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়া খাদ্যতত্ত্বসম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ যুগান্তর আনিয়াছে। এই জিনিষটির নাম ভাইটামিন—(Vitamine)। জীবদেহে প্রোটিন্, কার্ব্বোহাইড্রেট্, ফ্যাট্ ও অন্যান্য পদার্থ আছে। এই ফ্যাট্ জিনিষটির কোনও প্রয়োজন আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য জীবদেহ হইতে ফ্যাট্ তাড়ান হইল। কিন্তু দেখা গেল, ফ্যাট্ তাড়াইতে গিয়া এমন সব পদার্থ চলিয়া যাইতেছে, যাহা বাদ দিলে জীবদেহ টিকিতে পারে না। অথচ জিনিষটা এত ক্ষুদ্র যে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়

না। এই জিনিষটিই ভাইটামিন্। চারুবাবু তাঁহার পুস্তকে এই "ভাইটামিন" তত্ত্ব লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে ভাইটামিন্ লইয়া সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এমন সময়ে চারুবাবু তাঁহার ভাইটামিনকে সর্ব্বসাধারণের গোচরে আনিয়া, দেশের উপকার করিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত যতপ্রকার ভাইটামিন্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'এ', 'বি' 'সি', 'ডি' ও 'ই' পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারা যায়। চারুবাবু প্রথম তিনটি ভাইটামিন্ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, শেষোক্ত দুইটি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র,—তাহাদের বিষয় কিছুই বলেন নাই। জীবদেহে তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি ভিটামিন-তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার সামান্য আলোচনা করিলে মন্দ হইত না। ভাইটামিন সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর যাহা কিছু নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়াছে, ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহাও লিপিবদ্ধ দেখিব বলিয়া আশা করি।

চারুবাবুর এই বইখানির বিশেষত্ব এই যে, তিনি কেবল বাঙ্গালীর খাদ্যাখাদ্যের বিচার, এবং তাহাতে ভাইটামিনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কি উপায়ে অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে পুষ্টিকর সুখাদ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিয়াছেন। এবং কোন্ খাদ্য রুচি ও দ্রব্যগুণের দিক্ দিয়া কতখানি উপকারী তাহাও সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার একজন অধ্যাপক, ছাত্রদের ভালবাসেন, তাই তাঁহার এই পুস্তকটি বাংলার ছাত্রদের হাতেই দিয়াছেন। ছাত্রাবাসসমূহে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কিরূপে সস্তায় ভাল খাদ্যের আয়োজন করা যায়, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলাদেশে প্রতি গৃহস্থ ও ছাত্রদের নিকট এই পুস্তকখানি বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে আশা করি।

—বাসু

গল্পগুচ্ছ—(দুই খণ্ডে সমাপ্ত)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই নব-সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের 'গল্পগুচ্ছ' 'গল্পচারটি' ও 'গল্পসপ্তক' অন্তর্গত সমস্ত গল্পই আছে। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, এইরূপ কয়েকটি গল্পও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলি রচনার সময় অনুসারে সাজান। মূল্য প্রতি খণ্ড ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গীত-মালিকা—(গান ও স্বরলিপি) প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রথম সংস্করণ। মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

—নৃ

জর্জ বার্ণার্ড শ'

"বাঁশরী" পত্রিকার সৌজন্যে

কলিকাতা
১লা পৌষ, ১৩৩৩

গত সংখ্যায় তরুণ কবি হারীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। হারীন্দ্রনাথ ইংরেজীতেই কবিতা লিখিয়া থাকেন। কিন্তু বাংলা দেশের অনেকেই এই কারণে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার সন্ধান পান নাই। হারীন্দ্রনাথের কবিতার একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতাগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কোনও একটি বিশেষ ভাবকে অতিশয় সহজ কথায় ব্যক্ত করিতে পারে। হারীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা পূর্ব্বে জানাইয়াছি।

এবারে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করা হইল। শিশুকাল হইতে হায়দ্রাবাদে বাস করার দরুণ ইঁহাদের পরিবারের কেহই বড় বাংলা ভাষার সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই। ইঁহারা সকলেই বাংলার নিষ্ঠাবান্ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। এই বাঙালী মহিলা-কবির কবিতাগুলি ইংরেজীতেই রচিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা বাঙলার পাঠকদের ইঁহার কবিত্বের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্ম কয়টি কবিতার অনুবাদ ছাপিতেছি। কোনও ভাষা হইতে রচনা ভাষান্তরিত হইলে মূল রচনার রস ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য অল্পই রক্ষিত হয়। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, অবশ্য তাঁহারা নিশ্চয়ই এই Nightingale of the East-এর কবি-প্রতিভার সহিত পূর্ব্বেই পরিচয় লাভ করিয়াছেন। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলি কবির "Golden Threshold" পুস্তকের "স্বর্ণতোরণ" নাম দিয়া কয়েকটি কবিতার অনুবাদ। আরও কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আমাদের নিকট আছে, বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ওমর খৈয়ম-এর নাম বাঙলার বহু শিক্ষিত লোকের নিকট পরিচিত। ওমর খৈয়মের রচিত রোবাইয়াৎগুলি ইংরেজীতে বহুভাবে, বহুচিত্রশোভিত হইয়া অনূদিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষায়ও রোবাইয়াৎ-এর পদ্যানুবাদ হইয়াছে। সুকবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুবাদ অত্যন্ত সুললিত ও সহজ হইয়াছে। মূল্য অল্প ও পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেক গৃহেই স্থান পাইবার যোগ্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙলার পাঠক-সমাজে সুপরিচিত

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবও রোবাইয়াৎ-এর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কান্তিবাবু ও নরেন্দ্রবাবু উভয়ের অনুবাদকেই পারস্য কবির অতীত-মহিমা এক অভিনব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া প্রীতিসম্ভাষণ জানাইয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর বইখানি আকারে দীর্ঘ ও বহু ত্রিবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত। মূল্য কিছু অধিক হইলেও উপহার দিবার বা পাঠাগারে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য এই বইখানি একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী।

ওমর একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ওমর স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। ওমরকে অনেকেই, এমন কি তাঁহার আপন দেশীয় লোকেরা নাস্তিক মনে করিতেন, কিন্তু তাঁর রচনা হইতে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয়, তিনি নাস্তিক ছিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়াই মানুষের সুখ দুঃখ লইয়া তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে বিপুল বেদনায় গাথার পর গাথা গাঁথিয়া অভিযোগ আনিয়াছেন। ইংরজী ১১২৩ খৃষ্টাব্দে ওমর নৈশাপুরে দেহরক্ষা করেন। এক দিন তাঁহার মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

'আমার কবর এমন একটি যায়গায় হবে যেখানে কুসুমিত তরুশাখা হতে বর্ষে বর্ষে আমার সমাধির উপর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হবে।'

কিছুদিন পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশের সেহ্‌বান্ অঞ্চলে ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ-এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, সে সম্বন্ধে পারস্য দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত-কবি মীর্জ্জা কালিচ্ বেগ্ বলেন যে, ঐ কুড়াইয়া-পাওয়া পাণ্ডুলিপির রোবাইয়াৎগুলি আসলে ওমরের নহে। কেন না, ওমর জীবনে কখনও ভারতে বা সিন্ধুপ্রদেশে আসেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, পাণ্ডুলিপিখানি পুরাতন বটে তবে পাণ্ডুলিপির রোবাইয়াৎগুলি যে ভাষায় রচিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে ওমরের মূল রোবাইয়াৎগুলির ভাষাগত পার্থক্যও বিদ্যমান রহিয়াছে।

মীর্জ্জা সাহেবের এই যুক্তি দুইটির প্রথমটি সুযুক্তি নহে। ওমর ভারতে না আসিলেও তাঁহার পাণ্ডুলিপি অন্যের মারফতে আসাটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে, যাঁহারা ওমরের মূল রচনা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আলোচনা করিলে সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন আশা করা যায়।

অল্পদিন পূর্ব্বে খবর পাওয়া গিয়াছিল, মিষ্টার জর্জ বার্ণার্ড শ' এবার নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বার্ণার্ড শ' চিরকালই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। হয় ত বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মতামতের জন্য নোবেল পুরস্কার-সমিতির বিধির বাঁধনে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই প্রকাশ। যাহা হউক, এতকাল পরে এই বিখ্যাত ও বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তির যে এই পুরস্কারটি ভাগ্যে লাভ হইল তাহাও সুখের কথা।

গত ১৮ই নভেম্বরের লণ্ডনের সংবাদে জানা যায়, বার্ণার্ড শ' সুইডিস্ প্রতিনিধির মারফতে সুইডিস্ সাহিত্য পরিষদে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন—এই পুরস্কার তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য তিনি পরিষদকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন; তাঁহার পুস্তকের পাঠকবর্গ ও নাটকের শ্রোতারা তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজনের অনেক অধিক অর্থ দিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার উপরে তাঁহাকে পুরস্কারের লক্ষাধিক টাকা দান করিলে, যে সন্তরণকারী নিরাপদে আজ কূলে উঠিয়াছে তাহারই সাঁতারের সাহায্যের জন্য সোলার জীবন-রক্ষকের মত নিরর্থক হইবে। এ জন্য তাঁহার ইচ্ছা, ঐ ৬,৫০০ পাউণ্ড তাঁহাকে না দিয়া সাহিত্য ও কলা-বিদ্যার উন্নতিকল্পে দান করা হউক।

আমাদের প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথও যখন নোবেল পুরস্কারের অর্থ লাভ করেন, তখন ঐ সমস্ত অর্থ বিনাআড়ম্বরে 'বিশ্বভারতী'র সাহায্যকল্পে এককালীন দান করেন।

ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁসও তাঁহার নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দান করিয়াছিলেন।

২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বার্ণার্ড শ' যে উদ্দেশ্যে এই অর্থ দান করিতে চাহেন, পরিষদের নিয়মা-

বলী মতে তাহাতে বাধা আছে। পরিষদ সেই কারণে তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম। এইরূপ বাধা উপস্থিত হওয়ায় শ' অস্থায়ীভাবে ঐ টাকা নিজে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন্ এবং পরে আইন্ বাঁচাইয়া তাঁহার প্রস্তাবিত বে-আইনি ফণ্ডে দান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কল্লোলের পাঠকবর্গ জানেন, প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিবার কথা ছিল। আনন্দের সহিত জানাইতেছি, তিনি সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে পৌঁছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা খুবই কম।

গত ২০শে নভেম্বর আহম্মেদাবাদ হইতে সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কুমারী শ্লেড্ বলেন, ভারতীয় ভগ্নিগণ আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিয়া দিয়াছেন। সেবা ও নম্রতায় নারীজাতির জন্মগত অধিকার। ভারতীয় নারীদিগের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত বিকাশ ও নারীত্বের আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, নারীত্বের এই আদর্শ লাঞ্ছিত এবং অনাদৃত। সাম্য এবং স্বাধীনতা সেখানে নারীজাতির আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত সেবার অর্থ দাসত্ব নহে। প্রকৃত নম্রতা বলিতে নীচতা বুঝায় না। লোকে নারী-স্বাধীনতা ও নারী-সাম্যের নামে নাচিয়া উঠে, কিন্তু যদি তাহারা পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ স্বাধীনতাও অনেক সময়ে নিজের দাসত্বের শৃঙ্খলই রচনা করে। এবং ঐ যে সাম্য উহা উৎকট প্রতিযোগিতাতেই রূপান্তরিত হয়। পরিণামে উহা তীব্র অশান্তি ও অসন্তোষেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। পুরুষের আসনে নারীকে কখনই মানায় না। * * *

কুমারী শ্লেড্ নিজদেশ ত্যাগ করিয়া প্রাণের এক বিপুল ব্যগ্রতা লইয়া মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। তিনি জীবনের বিশালতার দিকে অগ্রসর হইতেই উৎকণ্ঠিতা। মহাত্মার বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া তিনি মহাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হন।

কুমারী শ্লেড্ ইউরোপীয়া মহিলা হইলেও এদেশে আসিয়া খদ্দর পরিধান করিয়া ভারতীয় জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ভারতীয় নারীগণ যেন জড়বিজ্ঞানের কুপ্রথার অন্ধ অনুকরণ হইতে বিরত থাকেন। স্বভাবদত্ত ভারতীয় কৃষিজাত ও কুটীরজাত সম্পদ সম্ভারেই যেন ভারতীয় নারীর অভাব মোচন ও মনস্তুষ্টি হয়। কুমারী শ্লেড্ ইউরোপীয়, তাঁহার আজন্মের শিক্ষা ও অবলম্বিত সামাজিক বিধি ও আচার তাঁহাকে জীবনের সমগ্রতার সন্ধান দিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার আদর্শকে তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এতাবৎকাল ভারতীয় ধর্ম্ম, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অধ্যয়নও আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় নারীদের সকলের পক্ষেই তাঁহার এই উপদেশ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে ভারতীয় নারী-সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাদকতা মাত্র প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কুমারী শ্লেডের মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কেবলমাত্র পুরুষের সেবার অধিকারী বলিয়া নারীকে বিশ্বের অন্য সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। তাহা সকলেই জানি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যেমন প্রত্যেকের জীবনের কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন, তেমনি শ্রেণীগতভাবে পুরুষ ও নারীর যে দৈহিক বা মানসিক সদ্‌বৃত্তিগুলির বিভিন্নতা হেতু কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা বিশ্বাস না করিলেও বারম্বার বিবেচনার বিষয়। পাশ্চাত্য দেশের জীবনগত প্রয়োজনাদি ও জীবনধারণের প্রণালী এ দেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল মাত্র শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে খর্ব্ব বলিয়াই এরূপ তাহা মনে হয় না। প্রকৃতির বিচিত্র লীলাও দেশে দেশে

মানুষের ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন জীবনধারা গড়িয়া তোলে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ভারতের পুরুষ ও নারী উভয়েরই জীবনধারা ও চিন্তার বিকাশ যে অন্য জাতি হইতে পৃথক থাকিবে তাহা অবধারিত ও ভারতীয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া বহুকালাবধি বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তনের বিরোধের ভিতর দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় ভারতের সকল শ্রেণীর নারীই পুরুষ-সাধিত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পুরুষ ও নারীর সাম্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবেন কি না, সে বিষয়ে বিবেচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের কল্লোলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের দুইটি কবিতা ছাপা হইয়াছে। তাহাতে ছাপার ভুল ছিল। আপনাদের তাহা জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি।

৪৫৯ পৃষ্ঠায় 'শুভদিন' কবিতার ৮ম লাইনে "পূর্ব্বাকাশা-তিমির-সিন্ধু" স্থানে "পূর্ব্বাশা-তিমির-সিন্ধু" হইবে।

৪৫৯ পৃষ্ঠায় 'ব্যবধান' কবিতার ২৬শ লাইনে "সিগ্ধ-হস্তখানি" স্থানে "স্নিগ্ধ-হস্তখানি" হইবে।

১৯২৫ সালের শান্তির জন্য নবেল প্রাইজ স্যর অষ্টিন চেম্বারলিন ও জেনারেল ডসকে দেওয়া হইল। ১৯২৬ সালের জন্য পাইয়াছেন এম, ব্রায়াঁ এবং হার ষ্ট্রেস্‌ম্যান্। এই পুরস্কার ঘোষণা উপলক্ষ্যে ডঃ ন্যান্‌সেন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ডস্‌-প্লানই প্রথম যুদ্ধান্ধ য়ুরোপের সম্মুখে আলোর সম্ভাবনা প্রদর্শন করায় এবং লোকার্ণোর চুক্তির প্রস্তাব প্রথম আসে ডাঃ লুথার, হার ষ্ট্রেসম্যান্ ও স্যর অষ্টিন্ চেম্বারলিনের নিকট হইতে। ব্রায়াঁ জর্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতার ভাব দূরীভূত করিবার জন্য রাইন-সর্ত্তের নিয়োগ পরিপূর্ণ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত তাঁহার মজিলপুরস্থ ভবনে ৬৩ বৎসর বয়সে হৃদরোগে দেহমুক্ত হইয়াছেন। এ যুগের অনেকেই তাঁহার রচনাদি পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। পূর্ব্বে এক সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে হারাণচন্দ্রের রচনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল।

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by S. K. Chatterjee, Bani Press, 33A, Madan Mitter Lane, Calcutta.

লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্

কল্লোল

চতুর্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,

১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

কল্লোল

মাঘ, ১৩৩৩

মহাক্ষুধা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

মহাক্ষুধা জাগে আজি প্রাণে।
জাগে দেহে, জাগে সবখানে!
এ রুদ্ধ দুয়ারে সে যে ঘন ঘন করে করাঘাত;
হেরি অকস্মাৎ—
ব্যক্তিরে সে আবরিয়া দেশে দেশে সমাজে সমাজে,
আপনার মহিমায় একছত্র রহে রাজ-সাজে!

নব নব প্রেরণার বলে
মানুষ সৃজি'ছে যা'রে মাটীর এ ধরণীর তলে,
আপনার রক্ত দিয়া, আপনার আশা-ভাষা সঁপি,
কল্পনায় যা'র নাম জপি'
মানুষ আনিছে ডেকে আপনার দেহের দুয়ারে,
অলক্ষিতে চিরদিন জানি সে যে চাহিয়াছে তা'রে;
—এই তার ক্ষুধা,
এই তা'র চিরন্তনী সুধা
জানি তারে করিছে আহ্বান—
দেশ হ'তে দেশান্তরে, মেরুশিরে এরি জয় গান!

কেহ তারে বলে আশা;
কেহ তারে কহে ভালোবাসা;
কেহ কহে জ্ঞান, প্রেম; কহে কেহ ধ্বংস সর্ব্বনাশা!
কেহ বা কল্যাণমূর্ত্তি হেরিতেছে সম্মুখে তাহার।
সে যে সত্য নগ্নরূপ এ বিশ্বের অনন্ত ক্ষুধার।

জানি তারে জানি ;---
আমারে সে দিল প্রাণ ; আমারে সে রূপ দিল আনি' ;
প্রথম আলোক-লিপিখানি
সে মোর ললাটে দিল সৃজনের শুভক্ষণে টানি' ;
তারপরে প্রতিদিন নব নব রূপে
তা'র সাথে হ'ল পরিচয় ;
আপন কামনা-ধূপে
তাহারে সুরভি' তুলি মানি মনে অপার বিস্ময় ;
ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে ক্ষুধা তার বাণী মোরে কয়।

সভ্যতার সর্ব্বঋদ্ধিমূলে,
এই ক্ষুধা মহাদান দিল তারে তুলে।
মৈত্রেয়ীর মহাবাণী দিল তার অতৃপ্তির মাঝে,
দিল বিশ্বসাধনার নব নব সাজে।
এল কভু শুভ্রবেশ পরি'
সুকঠোর তপস্যায় আপনারে সর্ব্বরিক্ত করি' ;
তারপরে বসন্তের দিনে,—
উমার মিলনে এল আপনার পথ চিনে চিনে,
তবু সে রহিল বসি' জাগি'—
যুগে-যুগে প্রাণে প্রাণে তৃপ্তিহীন মহা আশা মাগি'।

দিন চলি' যায় ;
এই ক্ষুধা নাহি রহে অনায়াস অলস শয্যায়!
গতি তা'র বাড়ি' চলে নানারূপে নানা সভ্যতায় !
জাতিতে জাতিতে তা'র সুমহান্ ডঙ্কা বাজি' যায় !

—উঠে ধীরে অনন্ত আহ্বান ;
দেশ হ'তে দেশান্তরে, মেরুশিরে এরি জয় গান।

———

মুস্কিল-আসান

শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
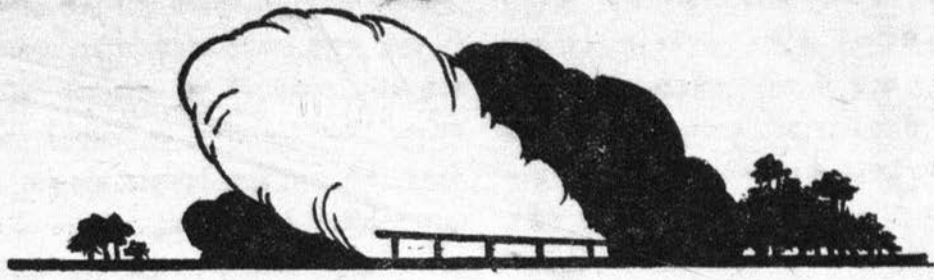
দুর্ভাগ্যের দেবতা একটা করিয়া বর দেন না-এই প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটার চরম সত্যতা আম্‌জাদ সেইদিনই নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইল, যে দিন অকস্মাৎ সর্ব্বাস্বান্ত পিতা অকাতরে চক্ষু মুদিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শহরের বাড়ীটায় আফিসের পেয়াদা হরকিষণ পাঁড়ে একখানা নীলামী এস্তাহার টাঙাইয়া দিয়া বোধ হয় আপন মনেই বলিতে বলিতে চলিল, সমস্তই ভগবানের মর্জ্জি এবং সে নিতান্তই হুকুমের চাকর, নচেৎ সে এতবড় নেমকহারাম্ পাষণ্ড নয় যে, এতকাল নির্ব্বিচারে যাহার তাঁবেদারী করিয়াছে, তাহারই এই ঘোর দুর্দ্দিনে সে অবলীলাক্রমে এমন দুষ্কার্য্য করিবে, ইত্যাদি।

কিন্তু থাকুক সেই কথা। যেটুকু বাকি ছিল, তাহাও পূরিতে বিলম্ব হইল না। আম্‌জাদের রুগ্না স্ত্রী স্বামীর হস্তে একটী শিশু কন্যা তুলিয়া দিয়া পাড়ি জমাইলেন। আঘাতের পর আঘাতে আম্‌জাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিভ্রান্ত হইল, অনেক কাঁদিল, অবশেষে মাতৃহারা কন্যাটীকে গুপ্তধনের মত বক্ষে আঁকড়াইয়া একদিন নিশাবসানে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্রকায় মামুদপুরের একপাশে সে ঠাঁই লইল। এক-রত্তি মেয়ে জহর ও খানকয়েক টুক্‌রা জমির মাঝখানে একটীমাত্র কুঁড়ে ঘর—ঐ ছিল তার সম্পদ। বিদ্যা তাহার সুপ্রচুর ছিল না, তবু যে টুকু ছিল, তাহারই পরখ্ করিতে যখন সে একদিন অলস গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে হাঁস-পুকুরের পাড়ে প্রবীন কাঁঠালী চাঁপার গাছতলায় জনকয়েক ভুঁই-মালী ও চাষী ছেলেদের লইয়া একটী নেহাৎ গেঁয়ো গোছের পাঠশালা খুলিয়া বসিল, তখন হইতেই গ্রামের বাসিন্দাগণ যেন অকারণে সচকিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে বেশ একটু সন্দেহের চোখে দেখিতে শুরু করিল।

দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া আম্‌জাদ দেখিত জহর মণ্ডল-পাড়ার মাণিকের মেয়ে সমবয়সী কলির সাথে খেলাঘর পাতিয়া রান্নায় ব্যাপৃত আছে।

—তোমাদের রান্না-বান্না হলো গো?

জহর চোখ টানিয়া বলিত, বাঃ রে, এত শীগ্‌গীর হয় বুঝি?

কলি বলিত, বোস না, মামা, এক্ষুনি ঠাঁই করে দিচ্ছি।

তারপর এই দুইটী পাকা গৃহিণীকে নিয়া পরিপাটী আহারের দৈনন্দিন মিথ্যা অভিনয় হইত। জহর যখন পিতার পাত্রে ভাও উজাড় করিয়া ফেলিত তখন আম্জাদ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিত না যে, কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ গুণটী পাইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী পরিচিত সুডৌল হস্তের সুচারু লীলাভঙ্গি মনে জাগিয়া উঠিত;—আহার কালে যে পরিবেশন-নিরত থাকিত, গৃহকার্য্যে যে সুনিপুণ চাঞ্চল্যে উছলিয়া উঠিত, লজ্জায় যে মুখে আঁচল ঢাকা দিত, শয়নে যে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বক্ষে এলাইয়া পড়িত!

দাওয়ায় বসিয়া আম্জাদ কত কি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। মনটা অতিমাত্রায় বিষাইয়া গিয়াছিল। এইমাত্র সে ভিন্ গাঁয়ের পুরান বন্ধু সামেদের সাথে দেখা করিয়া ফিরিয়াছে। এই আগন্তুক লোকটীকে ঘেরিয়া কত মিথ্যা, আজগুবি কথা ডাল পালা মেলিয়া মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া বন্ধুর কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে অথচ তাহার লেশমাত্র হেতুও সে ভাবিয়া পায় নাই!

সন্ধ্যার আবছায়া প্রতিদিনকার মত বেলা থাকিতেই ঢলিয়া পড়িয়াছে। সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সহসা দ্বার প্রান্তে জহরের অনভ্যস্ত কম্পিত হস্তে যখন সরবতের পাত্র দেখা গেল, তখন আত্মবিস্মৃত পিতার মুখে কথা সরিল না, এবং এই সেবা-নিরতা ক্ষুদ্র মেয়েটীকে যেন তাহার নিজের কাছেই রহস্যময় মনে হইল। সমস্তটুকু মিষ্টি সরবত সে একটানে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং মুখে পরম তৃপ্তির একটা 'আ' ভিন্ন অন্য কথা জোগাইল না বটে, কিন্তু মনে মনে ইহা উপলব্ধি করিয়া আরাম বোধ করিল যে, দারুণ পথ শ্রান্তির পর তাহার মন অত্যন্ত সাঙ্গোপনে ইহার জন্যই লালায়িত হইয়াছিল। কিন্তু আরও বিস্মিত হইল যে, এই সাত বছরের এক ফোঁটা মেয়ে এমন করিয়া তাহার অন্তর খুঁজিয়া দেখিল কিরূপে! অন্তর-নিরুদ্ধ সমস্ত বেদনা ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। যৌবন যাহার কাছে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে নাই, বসন্তের ঐ বিপুল ঐশ্বর্য্য যাহার কাছে অনাদরে ফিরিয়া গিয়াছে, জীবন যাহার বিষাদময়, ঐ অপহৃত মা-হারা কচি শিশু প্রাণটী তাহার দগ্ধ বুকটা করুণা ও মমতায় সিক্ত করিয়া রাখিল। এই ক্লান্ত সন্ধ্যায় আম্জাদের চক্ষু বারংবার জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে বলিল, নূর, তোমার মেয়ের বুকে এতমধু দিয়া গিয়াছিলে, বিনিময়ে বাপ হইয়া এক বিন্দু সোহাগও দিতে পারিলাম না, সে দুঃখ আমার কম নয়। কিন্তু মা হইয়া তুমি আল্গোছে সরিয়া গেলে কেমন করিয়া!

পূজা আসিল।

শান্ত পল্লীখানা অশান্ত আনন্দে সরগরম হইয়া উঠিল। সবুজ ঘাসের রেখা-টানা দীর্ঘ গ্রাম-পথটিতে উৎসবের আনাগোনার সাড়া পড়িল, গ্রামের একান্তে নিরুপদ্রব ক্ষুদ্র নদীটির বুক পণ্যদ্রব্যসম্ভারে জমকালো হইয়া উঠিল এবং সারা গ্রামখানি জুড়িয়া স্বজনবান্ধবের একটী নিবিড় প্রীতির রমণীয় বন্ধন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সহস্র রকমে দেখিয়াও জহরের আশ মিটিতেছিল না। একান্ত আগ্রহে নূতন কাপড়খানা বক্ষে চাপিয়া সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণে বা-জানের কাছে উহার জন্ম ইতিহাস উন্মুক্ত করিবে, উৎকণ্ঠায় সে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই ক্ষোভে ও অভিমানে বালিকা-চিত্তটি গুমরাইতে লাগিল। অন্যকার দিনটিতে এই অহেতুকী বিলম্ব না করিলে বুঝি চলিত না! মনে মনে সে শপথ করিয়া রাখিল, কিছুতেই সে হাসিয়া কথা বলিবে না এবং প্রচুর সাধ্যসাধনায়ও সে অবিচলিত থাকিয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় নিশিযাপন করিবে। কিন্তু নির্ব্বোধ মেয়ের আড়ি এক মুহূর্ত্তও টিকিল না, আমজাদকে ফিরিতে দেখিবামাত্র কেমন করিয়া তাহার সই-মা পূজার তত্ত্বের সঙ্গে তাহার জন্য এই সাড়ীখানা পাঠাইয়াছে, সমস্ত রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া যখন আনন্দের আতিশয্যে পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল, তখন আম্জাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল, এবং মেয়ের

সমস্ত দেহ যে ভয়ানক উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে, তাহা আবিষ্কার করিতে তাহার প্রয়াস পাইতে হইল না।

দেবতার গ্রাস হইতে কাহাকেও আগুলিয়া রাখা যায় না। কন্যার জীবন-প্রদীপ যে নিবিয়া আসিতেছিল, অন্ধ পিতা তাহা বুঝিল না। হাকিমী দাওয়াইর উপর তাহার অটুট আস্থা ছিল।

শুক্রবার, জোম্মাহ্ নমাজের দিন। আম্জাদ শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিল। অদূরের মস্জিদ্ হইতে মুয়াজ্জিনের আজান্ তাহার কানে আসিয়া পৌছিল। অভ্যস্ত নমাজ তাহাকে টানিতে লাগিল। একবার কন্যার অবসন্ন নিমীলিত চক্ষের পানে চাহিয়া সাবধানে ঝাঁপ টানিয়া সে যাই বাহির হইল, অমনি জহরের ক্ষীণ কণ্ঠ শুনা গেল, বাবা, জল!

ঠিক সেই সময়ে শেষবারের মত আজানের ডাক থামিয়া গেল। আম্জাদ দাঁড়াইল, কিন্তু বুকের মধ্যে কাহার ক্রুদ্ধ স্বর যেন শাসাইয়া উঠিল, বে-ইমান্, কম্বক্ত।

—এই যে আস্ছি মা। বলিয়া সে দ্রুতপদে যাইয়া সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নমাজ শুরু করিল কিন্তু মুদ্রিত নয়নে কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, জহরের রোগকাতর পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে অব্যক্ত যন্ত্রণা।

উন্মাদের মত ছুটিয়া গৃহে ফিরিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে ভয়ে, উদ্বেগে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং আর্ত্তনাদ করিয়া যখন সে কন্যার হিম দেহখানি তুলিয়া লইল, তখন কিছুই বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না! জহর মেঝেয় পড়িয়াছিল। নাক ও মুখ দিয়া অজস্র খুন ঝরিয়া রক্তগঙ্গা বহিয়া গিয়াছিল। সম্ভবত পিপাসার তাড়ণায় জহর উঠিয়া গৃহকোণে কলসীর কাছে যাইতেছিল, কিন্তু দেহের ভার দুর্ব্বল পা বহন করিতে পারে নাই, তাই অর্দ্ধ পথে পড়িয়া গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

পরদিন।

কলি আসিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল। আমজাদের বুভুক্ষিত উপবাসী চিত্ত সঙ্গীহীন এই বালিকার পানে চাহিয়া হা-হা করিয়া উঠিল এবং দীর্ঘদিনের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক যেমন করিয়া সম্মুখের খাদ্যভাণ্ডের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি উন্মাদ আগ্রহে ছুটিয়া কলিকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, হে ঈশ্বর, মরবার সময় হতভাগিনীর শেষ সময়ে একফোঁটা তেষ্টার জল দিতে পাই নাই, তার শাস্তি আমাকে দিও; কিন্তু এই একান্ত স্নেহাতুর নিষ্পাপ মেয়ের বুকে কোন্ প্রাণে এমন দাগা দিলে!

জহরের নিরন্তর সঙ্গী বিড়ালটা এ-দিকে ও-দিকে ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া অবশেষে উঠানের কোণে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, একবারও উঠিল না, খাদ্যান্বেষণও করিল না। করবীগাছের ছায়ার আড়ালে পরিচিত খেলনাগুলি অনাদরে পড়িয়াছিল। যে দিকে চক্ষু ফিরে, সেই দিক হইতেই স্মৃতির সুতীক্ষ্ণ দংশন রুখিয়া আসে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আর একবার সে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইল। খানিক যাইয়াই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং কি মনে করিয়া আবার ফিরিল। বাড়ীর গোয়ালে ঢুকিয়া গাভীটিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, যাও মা, তুমি মুক্ত। বুকের রক্তে যাহাকে তুমি লালন করিয়াছিলে, সেই যখন ফাঁকি দিয়া গেল, তখন আর তোমাকে শোষণ করিব না।

দূরে প্রচুর হল্লার সঙ্গে মিশিয়া স্বদেশী খেলাফৎ সেবকের তুমুল 'আল্লাহ্ হো আকবর' শুনিয়া আম্জাদ চমকাইয়া উঠিল। ঐ ভয়ঙ্কর ডাকটাই যেন তাহার অন্তরের সকল অবশেষের গোপন আনন্দের খনি হরণ করিয়া লইয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে সে কেবলি আবৃত্তি করিতে লাগিল, খোদা, তোমার জয়যাত্রা সর্ব্বত্র অক্ষয় হউক, কিন্তু তোমার রুদ্র অভিশাপ হইতে বিশ্বমানবকে নিষ্কৃতি দাও। তোমার ধর্ম্মাধিকরণে আমার অনেক দুষ্কৃতি, অশেষ শাস্তি মজুত আছে। আমার সকল জঞ্জাল, সকল কাঁটা, সকল আবর্জ্জনা তুলিয়া নিয়াছ নিয়াছ; কিন্তু আমার জন্ম জন্মান্তরের সহজ বিশ্বাসটুকু হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিও না, আমাকে একেবারে কাঙাল করিও না। আমার চোখের জলে

তুমিই বন্যা বহাইয়াছ, তুমিই তাহা রোধ কর, দমন কর।

বৎসরান্তে একটী বিশেষ দিনে নদীতীরে একটী বিশেষ স্থানে সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর ফকিরটী আসিয়া বসে। মাটীর উপর কান পাতিয়া কাহার আগমনের পদশব্দের জন্য সে যেন উৎকর্ণ হইয়া থাকে, কেউ আসে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কবরটীর উপর একটা 'চেরাগ' জ্বালাইয়া দিয়া সে মাঠের পথে চলিতে শুরু করে। চাষী ছেলে জিজ্ঞাসা করে, কে যায় গো অন্ধকারে?

উত্তর আসে, চিনবি না বাবা, মুশাফের,—মুস্কিল-আসান।

বংশী-হারা

জসীম উদ্দীন

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে,
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে!

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
পায়ের নুপুর পড়িছে খসিয়া,
ফেলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া
তেমন করে;

কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।

কোথায় খেলার সাথীরা আমার
কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রাঙিয়া উঠিছে
গো-খুর রেণু,

ফোটা সরিষার পাঁপড়ীর ভরে
চোরো-মাঠখানি কাঁপে থর-থরে,
সাঁঝের শিশির পায়ে পায়ে প'ড়ে
কাঁদিয়া ঝরে;
কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্টিচরণ যে দিন সংসার-রঙ্গমঞ্চে পাকা অভিনেতা হইয়া দাঁড়াইল ; সে দিন ছোট ভাই কালীকিঙ্কর কিন্তু মনে মনে সুখী হইতে পারিল না। তবে দাদার বিবাহই যে তাহার মনঃকষ্টের কারণ তাহা নহে, বরং সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, কবে এমন দিন আসিবে যে দিন বৌদির পায়ের তলায় আপনার মাতৃ-বিয়োগ জনিত কষ্টের বোঝা নামাইয়া দিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিবে।

কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল। পাড়ার সেই আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবহীনা শিবানী ; যাহাকে সে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না, যাহার কথা চিন্তা করিলেও তাহার অন্তরে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত, তাহাকেই কিনা বৌদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে! অভিমানে দুঃখে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। কিছুতেই, কোন মতেই সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

তবে ইহার প্রতিকূলে সে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, নিজের দুর্জ্জয় অভিমান ত্যাগ করিয়া ভ্রাতাকে একাধিকবার বলিয়াছিল,—আমার মত নাই, সে তোমার উপযুক্ত নয়। তথাপি যখন তাহার সে প্রার্থনার কোন ফল হয় নাই, তখন আর সে কি করিতে পারে।

বিবাহের পর আরও কত দিন কাটিয়া গেল। কালীকিঙ্কর কিন্তু শিবানীকে বৌদি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিল না ; আর শিবানীও তাহাকে সে জন্য অনুরোধ করিল না। উপরন্তু মাঝে মাঝে কালীকিঙ্কর এমন এক একটা কাণ্ড করিয়া বসিতে লাগিল যে, ভাবিলেও লজ্জা হয়। ষষ্টিচরণ শুধু একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া নিবৃত্ত হওয়া ছাড়া পথ খুঁজিয়া পাইত না ; মুখে বলিত, অমন করতে আছে কি, ছি! লোকে নিন্দে করবে যে।

কালীকিঙ্কর ত দমিত না-ই, বরং গম্ভীরভাবে উত্তর দিত, হুঁ!

সেদিন একটা কার্য্যোপলক্ষ্যে ষষ্টিচরণ জেলায় গিয়াছিল। কালীকিঙ্কর সংসারের কোন কাজেই লাগত না, প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে অনাবশ্যক গল্পগুজবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া সে বাটীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইত। পরে ক্ষুধানল তাহার সে সমাধি ভঙ্গ করিলে সে গৃহে ফিরিত। আজও তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ঢুকিয়া সে ডাকিল, কোথায় গো, নবাব ঠাকরুণ, খেতে হবে না, না কি?

শিবানী হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, কে বাবু সাহেব বুঝি, পেটের জ্বালা ধরেছে, কেমন?

হুঙ্কার দিয়া কালীকিঙ্কর কহিল, হ্যাঁ, এখন দেবে কিনা তাই শুনি।

উচ্চহাস্যে সে কথা ডুবাইয়া দিয়া শিবানী কহিল, মারবে নাকি? গাঁয়ের মধ্যে মোড়ল হচ্ছ, বৌদিকে মারবে না ত মারবে কাকে?

তুমি আবার বকছ? বলিয়া কালীকিঙ্কর অন্নে মন নিবেশ করিল। সকালের রান্না, কাজেই ভাতগুলি শক্ত হইয়া গিয়াছিল। ডেলা ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে সে কহিল,